উপন্যাস

ফুলমণি-উপাখ্যান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১-২. কাঁচা ভাত-ঘুম..2
৩-৪. মুরগি রান্না... 3 1
৫-৬. এই সব ছবি.. 7 3
৭-৮. প্রদর্শনী উদ্বোধন 9 9
৯-১০. দিকশূন্যপুরে...1 3 2

১-২. কাঁচা ভাত-ঘুম

দুপুরবেলার কাঁচা ভাত-ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল চন্দনদা।

দিনটা চমৎকার। সকাল থেকেই রিমঝিম ঘন ঘন রে।

বাজারে ইলিশ মাছ সস্তা। এমন দিনে মাকে বলা যায়। বলা যায় খিচুড়ি, খিচুড়ি! পৃথিবীতে আর কোনও খাবার নেই, যার স্বাদ বৃষ্টির দিনে বেশি ভাল হয়ে যায়, খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজার মতো। খাওয়ার পর বাথরুমে না গিয়ে আমি আঁচালাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জলে। সারা গায়ে বৃষ্টির গন্ধ হয়ে গেল।

এরপর একখানা বই বুকে নিয়ে ঘুম না দেওয়ার কোনও মানে হয় না। যত আকর্ষণীয় প্রেমের গল্প বা গোয়েন্দা গল্পই হোক, বিছানায় গা এলিয়ে দেবার পর দু'চার পাতার বেশি পড়া যায় না, চোখ জুড়িয়ে আসে। খিচুড়ির ঘুমের চরিত্রই আলাদা। এই ঘুম আসে খুব মৃদুভাবে। প্রথমে একটা নাচের ছন্দ শোনা যায়। মনে হয় যেন সুরলোকের নাচ-গানের আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে অবচেতনে। তারপর কোথা থেকে একটা নরম মখমলের চাদর উড়ে এসে ঢেকে দেয় শরীর। কেউ যেন কোমল আঙুল বুলিয়ে দেয় দু'চোখের পাতায়। ছোট ছোট স্বপ্ন ঝিলিক দেয়। তারপর বিছানা, খাট-ফাট সুষ্ঠু সব কিছুই ভাসতে থাকে শূন্যে।

আহা, এই রকম দিনেও এত লোককে অফিসে, স্কুলে কলেজে যেতে হয়। তারা কী দুঃখী! রাস্তায় গোড়ালি-ডোবা জলে ছপছপিয়ে যাও, তারপর বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। এরই মধ্যে কোনও গাড়ি বা ট্যাক্সি তোমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে চলে যাবে। হঠাৎ মনে হবে, কোনও কাক এসে বুঝিমাথায় একটা ঠোক্কোর মারল, আসলে সেটা পাশের মানুষের ছাতার শিকের খোঁচা। বাইরে ফিনফিনে হাওয়া অথচ বাসের মধ্যে গরম আর ঘাম।

অধিকাংশ অফিসেই জানলা দেখা যায় না, জানলা থাকলেও আকাশ দেখা যায় না, দিনেরবেলাতেও আলো জ্বলে। বেচারা চাকরিজীবীরা কী হতভাগ্য।

আমি বাল্যকালে কোনও পাপকরিনি। স্কুলে পড়ার সময় খামোকা ক্লাসের অন্য বন্ধুদের বঞ্চিত করে ফার্স্ট-সেকেন্ড হবার চেষ্টা করিনি কক্ষনও। কলেজে লেকচারাররা যখন শেলি-কীটসের কবিতা কাটা-ছেঁড়া করতেন, তখন দিব্যি আড্ডা মারতাম কফি হাউজে, অর্থনীতির কূটকচালি নিয়ে মাথা ঘামাইনি কোনও দিন, ইতিহাসের বই সামনে খুলে হাত মকসো করতাম প্রেমপত্র লেখায়। এই সব সুকৃতির ফলে চাকরির বাজারে আমার দাম কানাকড়ি, স্বেচ্ছায় দাসত্ব খোঁজার জন্য হন্যে হতে হয়নি আমাকে। আমি বেঁচে গেছি। শহরের রাস্তায় যখন মাইনে বাড়াবার মিছিল দেখি, আমার মজা লাগে। আমাকে ওই গড্ডলিকা প্রবাহে কোনও দিনও যোগ দিতে হবে না। আমার কিছুনা-কিছু খুচরো পয়সা রোজ জুটে যায়, তাই-ই যথেষ্ট।

এমন চমৎকার, মোহময় একটা দিনে যারা চাকরি করছে করুক, আমি খিচুড়ি-ইলিশ মাছ দিয়ে আত্মাকে পরম সন্তুষ্ট করে, বিছানায় শুয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে চলে গিয়েছিলাম ঘুমের দেশে।

আধ ঘণ্টাও ঘুমোইনি, এর মধ্যে মূর্তিমান উপদ্রবের মতো চন্দনদার আবির্ভাব। হাঁটু দিয়ে আমার পিঠে একটা গোঁত্তা মেরে জলদগম্ভীর স্বরে ধমক দিয়ে বলল, এই নীলু, ওঠ! ওঠ!

আমি চোখ মেলে প্রথমে চন্দনদাকে চিনতেই পারলাম না। এমনিতেই তার বেশ বড় সড় চেহারা, তার ওপরে আবার একটা খয়েরি রেইন কোট পরে আছে, মনে হয় যেন একটা দৈত্য।

আমি ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কে? কে?

চন্দনদা বলল, দুপুরবেলা ষাঁড়ের মতো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিস, তোর লজ্জা করেনা? পুরুষ মানুষ কখনও দুপুরে ঘুমোয়?

দিবানিদ্রার ব্যাপারে নারী জাতিরই কেন একচেটিয়া অধিকার থাকবে, তা আমার বোধগম্য হয় না। কাঁচা ঘুম ভাঙলে মাথায় অনেক কিছু ঢোকেও না।

চন্দনদার গলার আওয়াজ ও ভাষা চিনতে পেরে আমি বললাম, খিচুড়ি খাবে? এখনও আছে অনেকটা।

চন্দনদা একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, কী আবোল তাবোল বকছিস! আমি হঠাৎ এই অসময়ে খিচুড়ি খেতে যাব কেন?

দু'হাতে চোখ কচলে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম।

চন্দনদাকে বেশকয়েক মাস বাদে দেখলাম, ওঁদের বাড়িতেও আমি যাইনি অনেক দিন। এর আগে দু'একটা ঘটনার জন্য চন্দনদা আমার ওপর খানিকটা বিরূপ হয়েছিল। একবার মারবেও বলেছিল। কিন্তু সে-সব তো চুকেবুকে গেছে। এর মধ্যে আমি তো আর কোনও গণ্ডগোল করিনি, ওদের পারিবারিক ব্যাপারেও নাক গলাইনি, তাহলে হঠাৎ এই বৃষ্টির দিনের প্রাকবিকেলে চন্দনদা আমাকে হাঁটুর গোঁত্তা লাগাতে এল কেন? অজান্তে কিছু দোষ করে ফেলেছি নাকি?

চন্দনদা গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, ছি ছি ছি, কোনও কাজকম্ম নেই, দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস। যুব শক্তির কী অপচয়! এই জন্যই তো দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে। আর কিছু কাজ না থাকে তো রাস্তার গাছগুলোতে জল দিলেও তো পারিস। তাতে শহরটা সবুজ হবে।

এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার গাছে পাগল ছাড়া কেউ জল দিতে যায়? গাছেরাই-বা কী ভাববে। চন্দনদাকে এ-কথা বলে লাভ নেই, যা মেজাজ দেখছি, আবার বকুনি খেতে হবে।

ভেতরের পকেট থেকে চন্দনদা একটা চুরুট বার করে ঠোঁটে গুঁজল, তারপর তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললাম, দেশলাই দেব?

চোখ কটমট করে চন্দনদা বলল, আমার দেশলাই লাগে? উজবুক! জানিস না?

ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েক বছর ধরে চন্দনদা ধুমপান ত্যাগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সিগারেট বর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু মুখে একটা চুরুট না রাখলে চলে না। সন্ধের সময় সেটা ধরায়।

প্রতি দিন একটা চুরুট খাওয়া চাই।

এবার রেইন কোটের পকেট থেকে বার করল একটা চৌকো প্যাকেট। দেখে মনে হয় মিষ্টির বাক্স। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নে, ছোটপাহাড়ি থেকে তোদের জন্য সন্দেশ এনেছি।

এ আবার কী ব্যাপার। প্রথমে হাঁটুর গুতো, তারপর সন্দেশ? একেই বলে হট অ্যান্ড কোল্ড ট্রিটমেন্ট। চন্দনদার সবকিছুই অদ্ভুত।

প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিলাম, চন্দনদা বলল, খুলে দেখলি না? খা একটা! এ-রকম সন্দেশ কলকাতায় পাবিনা।

পরে খাব চন্দনদা।

না, এখনই খা। এত দূর থেকে আনলাম।

মুখে যার টাটকা ইলিশ মাছ ভাজার স্বাদ লেগে আছে, তাকে মিষ্টি খেতে বলা অত্যাচারের মতো নয়?

প্যাকেটের বাঁধন খুলে দেখা গেল তার মধ্যে চকোলেট রঙের দশ-বারোটা ছোট ছোট সন্দেশ রয়েছে। একটা তুলে মুখে দিতেই হল। পোড়া পোড়া ক্ষীরের স্বাদ। মন্দ না। আমি সন্দেশ-রসিক নই, তবু মনে হল, এটা অন্য ধরনের।

বললাম, চমৎকার। ছোটপাহাড়িতে এত ভাল মিষ্টি পাওয়া যায়।

তোর জন্য দু'রকম সন্দেশ এনেছি নীলু!

রক্ষে করো চন্দনদা, আমি আর খেতে পারব না। একটাই যথেষ্ট।

তোকে দুটো সন্দেশ খেতে বলিনি ইডিয়েট। বললাম না, দু'রকম। একটা হচ্ছে এই সন্দেশ মানে মিষ্টি। আর একটা সন্দেশ হচ্ছে খবর। খুবই সুখবর! তুই একটা চাকরি পেয়েছিস!

অ্যাঁ?

কথাটা কানে গেল না তোর? তুই একটা চাকরি পেয়েছিস! চাকরি, চাকরি!

চাকরি?

অমন ভেটকি মাছের মতো তাকিয়ে রইলি কেন? অন্য যে-কোনও ছেলে এই খবর শুনে লাফিয়ে উঠত!

আমার এমন ক্ষতি করতে কে বলল তোমাকে চন্দনদা?

ক্ষতি? প্রিপস্টারাস! এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি! দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার, কেউ কোনও চান্স পায় না, আর তোকে একটা প্লেটে করে সাজিয়ে...।

আমি তো বেকার নই। আমি কি অ্যাপ্লিকেশন করেছি কোথাও? যে চাকরি চায় অথচ পায় না, সে তো বেকার। আর যে চাকরি খোঁজেই না, চাকরির যার দরকার নেই, তাকে কি বেকার বলা যায়?

তুই বেকার নোস?

ডিকশিনারি দেখো।

আমার সঙ্গে চ্যাংড়ামি হচ্ছে নীলু! ওঠ, জামা পর!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যারা ভাল ভাল চাকরি করে, কিংবা ব্যবসায় সার্থক, যারা কর্মবীর, তাদের কিছুতেই বোঝানো যায় না আমার যুক্তিটা। সবাইকেই কি চাকরি করতে হবে, কোনও না-কোনও কাজের জোয়াল ঘাড়ে নিতে হবে? তাহলে কদমতলায় বসে বাঁশি বাজাবে কে? কে ছবি আঁকবে? যাত্রাদলে নতুন ছেলে আসবে কী করে? এসবও যারা পারে না, স্রেফ বাউণ্ডুলেপনা করার জন্যও তো কিছু মানুষ দরকার। যে-জাতের মধ্যে বাউণ্ডুলে কিংবা ভবঘুরে নেই, সেজাতের কখনও উন্নতি হতে পারে?

আমি হাত জোড় করে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও চন্দনদা। আমার এমন সর্বনাশ কোরো না।

চন্দনদা চোখ কপালে তুলে বলল, সর্বনাশ? দু'হাজার সাতশো টাকা মাইনে পাবি।

চুপ, চুপ, আস্তে। অত টাকার কথা মা শুনতে পেলে কান্নাকাটি করবে।

মাসিমাকে কষ্ট দিচ্ছিস। দাদার ঘাড়ে বসে খাচ্ছিস। তোর লজ্জা করেনা? সবাই বলে, চেনাশুনো সকলেরই মোটামুটি হিল্লে হয়ে গেল, শুধু নীলুটাই গাছদামড়া হয়ে রইল। লাফাংগার মতো ঘুরে বেড়ায়, হ্যাংলার মতো লোকের বাড়িতে ঠিক খাওয়ার সময় গিয়ে হাজির হয়।

বাজে কথা। নেমন্তন্ন না করলে আমি কারুর বাড়িতে যাই না। এমনকী নেমন্তন্ন করলেও সব বাড়িতে যাই না।

তুই এক দিন ভরপেট খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েও লালুদার সঙ্গে টলি ক্লাবে গিয়ে গোগ্রাসে গিলিসনি?

সেটা অন্য কথা। লালুদা আমাকে জোর করে খাইয়েছে। লালুদা আমাকে দিয়ে একটা কাজ করাতে চাইছিল।

লালুদাই বলেছে, দরকার হলে তোকে ঘাড় ধরে চাকরির জায়গা নিতে হবে।

আমাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে না?

তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

আমি এবার মুচকি হাসলাম। চন্দনদা গোঁয়ার লোক, কাকুতি-মিনতি করে ছাড়া পাওয়া যাবেনা। ইন্টারভিউতে ফেল করা অতি সহজ। এমনকী যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাই ...এর আগেও কেউ কেউ আমাকে দু'এক জায়গায় জোর করে কাজে ঢুকিয়েছে, সিঙ্গাপুর থেকে আমার এক মামা এসে তো উঠে পড়ে লেগেছিল। সবকটা চাকরি থেকেই আমি অবিলম্বে সগৌরবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। চাকরির মালিকদের আমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, আমিই একমাত্র, যে বরখাস্ত হলেও আন্দোলন করে না। নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে আসে।

না-ধরানো চুরুটটা দু'বার টেনে চন্দনদা গলা নরম করে বলল, আচ্ছা নীলু, তুই কেন কাজ করতে চাস না বল তো? তোর ইচ্ছে করে না, নিজে রোজগার করবি, নিজের পায়ে দাঁড়াবি, লোকজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে থাকবি?

মাথা উঁচু করেই তো আছি। তুমিই বলল, কার মাথা বেশি উঁচু, যে দান করে, না যে দান প্রত্যাখ্যান করে? এ-দেশে কত ভাল ভাল ছেলে মেয়ে রয়েছে পড়াশুনা শেষ করেও

কোনও সুযোগ পায় না, তোমাদের মতো লোকেরা ভাবো, আহা বেচারারা...যুবশক্তির অপচয়...তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জনকে ডেকে, তোমরা ছিটেফোঁটা দায় বিলোও! যে-কোনও একটা চাকরি দিয়েই ভাবো তাদের ধন্য করে দিলে! আমি সেই সব ছেলে-মেয়ের পক্ষ থেকে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। আমি দয়া চাই না। আমি দয়া চাই না। সারা জীবন আমি এই ধ্বজা উড়িয়ে যাব।

তোমাকে সে-সুযোগ দেওয়া হবে না শয়তান। শুধু বাজে কথার ফুলঝুরি। আমরা সবাই খেটে খেটে মরব, আর তুই শুধু মজা করবি! ইয়ার্কি! কালকেই তোকে ছোটপাহাড়িতে যেতে হবে!

ছোটপাহাড়িতে কেন?

সেখানেই তো তোর কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বদলে গেল। অন্ধকার বাড়িতে পটাপট আলো জ্বলে ওঠার মতো খুশির ধাক্কা লাগল আমার সবকটা ইন্দ্রিয়তে। ছোটপাহাড়ি! সে যে অপূর্ব সুন্দর একস্থান। সব দিকে গোল হয়ে ঘিরে আছে সবুজ মখমলে ঢাকা পাহাড়। মাঝখানটাতেও এত গাছপালা যে, তার ফাঁকে ফাঁকে কিছু বাড়ি-ঘর থাকলেও চোখে পড়ে না। মনে হয় এক সবুজের রাজ্য। দিনে দুবার বাস যায়, তাছাড়া তেল-কালি-ধোঁয়ার কোনও উপদ্রব নেই। ছোটপাহাড়িতে একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তার ধারে আমি যত বনতুলসীর ঝাড় দেখেছি, সে-রকম বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বিনা যত্নে, বিনা প্রয়োজনে এত অসংখ্য ফুল ফুটে আছে, এক-একটা ছোট ছোট ফুলের কত রকম রঙ! সেই সব ফুলের একটা স্নিগ্ধ টান আছে। ওই বনতুলসীর ঝাড়ের কাছে আবার যাবার জন্য আমি যে-কোনও মূল্য দিতে রাজি আছি।

ছোটপাহাড়িতে কী কাজ চন্দনদা?

সেইসব পরে বুঝিয়ে দেব। মোট কথা, তোকে যেতেই হবে।

যেতেই হবে, কী বলছ? ছোটপাহাড়িতে নিয়ে গিয়ে যদি তুমি আমাকে তোমার কোয়ার্টার ঝাঁট দিতে বলো, তোমার জন্য রান্না করে দিতে বলো, তোমার জুতো পালিশ করে দিতে বলো, সব রাজি আছি।

চন্দনদা এবার হকচকিয়ে গেল, আমার আকস্মিক মতি পরিবর্তনের কারণটা ধরতে পারল না। বুঝবে কী করে, চন্দনদা সেই বনতুলসীর জঙ্গলের দিকে বোধহয় কোনওদিন চেয়েও দেখেনি।

আমি তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে বললাম, তুমি চা খাবে? এক্ষুনি চা আনছি। আরকী খাবে বলো, গরম গরম কচুরি? ডাবল ডিমের ওমলেট?

চন্দনদা বলল, এখন কিছু খাবনা। বৃষ্টি অনেকটা কমেছে, চল তোকে বেরোতে হবে।

তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবি চাপিয়ে, টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমার সঞ্চয় সাত টাকা আশি পয়সা পকেটে নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। চন্দনদা কোম্পানির গাড়িতে এসেছে। চন্দনদাদের হেড অফিস কলকাতায়, মাঝে মাঝে চন্দনদাকে ছোটপাহাড়িতে গিয়েও থাকতে হয়।

খাঁকি পোশাকও মাথায় টুপি পরা ড্রাইভার তাড়াতাড়ি চন্দনদাকে দেখে নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমি যখন চাকরি করব, তখন কি আমাকেও... দু’হাজার সাতশো টাকার মাইনেতে কি গাড়ি দেয়?

চন্দনদার বাড়ির সামনে একটা লাল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ লালুদা এসেছে, নীপা বউদির বয়ফ্রেন্ড। আজকাল চন্দনদাও লালুদাকে সহ্য করে নিয়েছে। লালুদার অবাধ যাওয়া-আসা আটকাবার কোনও উপায় নেই!

লালুদা ছাড়াও রয়েছে তপনদা। তপনদা কলকাতার বাড়িওয়ালাদের ঝামেলা সহ্য করতে না পেরে পাকাপাকি বম্বে চলে গিয়েছিল, কোনও কাজে আবার এসেছে বোধহয়। তিন

জনে ভিসিআর এ একটা ছবি দেখছিল নিবিষ্ট ভাবে, চন্দনদা ঘরে ঢুকেই বলল, এখন ও-সব বন্ধ করো।

লালুদা বলল, আর একটু দেখে নি, মেয়েটার ডেড বডি খুঁজে পাওয়া গেল কি না।

চন্দনদা বলল, এই জন্যই আমি বসবার ঘরে টিভি রাখা পছন্দ করি না। ইচ্ছে মত কথা বলার উপায় নেই।

নীপা বউদি ভিসিআর অফ করে দিয়ে হাসিমুখে বলল, তুমি সিনেমা দেখতে ভালবাসোনা বলে কি আর কেউ দেখতে পারবে না?

রান্না ঘরে টিভি লাগাও, ভিসিআর লাগাও, যত ইচ্ছে দেখো।

দেয়ালে গোপাল ঘোষের আঁকা একটা প্রকৃতি-দৃশ্যের ছবি। চন্দনদা ছবি ভালবাসে, প্রায়ই এ বাড়ির দেয়ালের ছবি বদলে যায়। ছবিটার কাছে গিয়ে চন্দনদা বলল, এ, ছবিটা বেঁকে রয়েছে। সেটুকুও তোমরা লক্ষ্য করো না?

নীপাবউদি বলল, জানলার পাশে কেউ ছবি রাখে? এ-দিকের দেয়ালটা আবার তোমার পছন্দ নয়।

নীপাবউদি আর চন্দনদার ঝগড়া বিখ্যাত। যে-কোনও ছুতোয় একবার শুরু হলে কখন যে থামবে তার ঠিক নেই। ওরা অবশ্য বলে, এটা ঝগড়া নয়, মতভেদ, তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু সেই তর্ক-বিতর্কে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যায়।

তপনদা আমার দিকে ভুরু নাচিয়ে বলল, কী রে নীলু, ধরা পড়ে গেলি শেষ পর্যন্ত।

এবাড়িতে মুমু আমার একমাত্র বন্ধু। তার সাড়াশব্দ নেই। আমি নীপাবউদিকে জিজ্ঞেস করলাম, মুমু কোথায়?

নীপাবউদি বলল, সাঁতারের ক্লাসে গেছে। আজকাল খুব সাঁতারের ঝোঁক হয়েছে।

আমি চমৎকৃত হলাম। গানের ক্লাস, নাচের ক্লাস, ছবি আঁকার ক্লাস এ-সব শুনেছি। সাঁতারেরও ক্লাস? তা-ও এ-রকম বৃষ্টির দিনে। কোনও ঘরের মধ্যে হয় বোধহয়।

লালুদা আমার দিকে তাকিয়ে কান-এঁটো-করা হাসি দিয়ে বলল, আমরা সবাই তোমার জন্য খুব চিন্তিত ছিলাম নীলাদ্রি। আমাদের চেনাশুনো সকলেই কোনও না-কোনও কাজ করে, শুধু তুমিই বেকার বসেছিলে। চন্দন তোমার জন্য একটা কাজ জোগাড় করে এনেছে, এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু–।

লালুদা একটু থামতেই চন্দনদা ধমক দিয়ে বলল, এর মধ্যে আবার কিন্তু কী আছে?

লালুদা আমার দিকে আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বলল, নীলকান্তর এত বড় বড় চুল মাথায়, এইভাবে কি চাকরিতে জয়েন করা চলে?

নীপাবউদি বলল, সত্যি, তুমি ক'মাস চুল কাটোনি!

লালুদা বলল, আহা বেকার ছেলে, পয়সা পাবে কোথায়? আমি সেলুনে নিয়ে গিয়ে ওর চুল কাটিয়ে আনছি!

চন্দনদা বলল, কোনও দরকার নেই। বড় চুল আছে তো কী হয়েছে।

লালুদা বলল, বড় চুল থাকলে ক্ষতি নেই বলছ? থাক তবে। কিন্তু –।

আবার কিন্তু?

আমি যত দিন দেখছি, নীলমণি শুধু পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে থাকে। ওর কি প্যান্ট শার্ট আছে?

তপনদা মুচকি হেসে বলল, ভারতীয় সংবিধানে কোথাও লেখা আছে কি যে, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে চাকরি করা যাবে না?

লালুদা বলল, সব কিছুর একটা ডেকোরাম আছে তো! বাড়িতে পাজামা পরা যায়, বেকার অবস্থায় বাইরে ঘোরাঘুরিও করলে ক্ষতি নেই, রাস্তায় ঘাটে পাঞ্জাবি-পাজামা পরা ছেলে-ছোকরা দেখলেই বুঝতে পারি বেকার। কিন্তু চাকরির জায়গায় ফিটফাট হয়ে না গেলে লোকে মানবে কেন?

চন্দনদা বলল, হ্যাঁ, প্যান্ট-শার্ট হলে ভাল হয়। কী রে, তোর প্যান্ট-শার্ট নেই?

লালুদা তাড়াতাড়ি বলল, আমি কিনে দেব। এক জোড়া করে প্যান্ট-শার্ট, শু-মোজা-টাই...এখনও নিউ মার্কেট খোলা আছে, চলো নীলরতন।

আমাকে নিয়ে একটা গিনিপিগের মতো যেন কাটাছেঁড়া চলছে। এবার মুখ খুলতেই হল। ভুরু তুলে বললাম, টাই-ও পরতে হবে? দু' হাজার সাতশো টাকা মাইনে তো আজকাল ব্যাঙ্কের বেয়ারা দারোয়ানরাও পায়। তাই না নীপাবউদি? তারা কি টাই পরে?

চন্দনদা বলল, ওরে বাবা! এই যে সবাই বলে নীলু নাকি চাকরি করাটাই পছন্দ করে না। এখন দেখছি মাইনে নিয়ে দরাদরি শুরু করেছে।

আমি বললাম, দরাদরি না। ওই যে লালুদা বলল, ডেকোরামের কথা! সবঅফিসেই দেখেছি বড় সাহেব, মেজো সাহেবরা টাই পরে। যদি খুদে কেরানি আর বেয়ারারাও টাই পরতে শুরু করে, তাহলে ওই সব সাহেবরা চটে যাবেনা?

চন্দনদা বলল, টাই দরকার নেই। প্যান্ট শার্ট হলেই চলবে।

লালুদা বলল, তাহলে চলো নীলকণ্ঠ, ওগুলো কিনে ফেলা যাক।

আমি বললাম, প্যান্ট-শার্ট আমার আছে।

জুতো-মোজা?

চটি আছে।

না না, ট্রাউজার্সের সঙ্গে চটি একেবারেই চলবে না। শু, ভাল শু।

সমস্ত পৃথিবীটা আপনার টলি ক্লাব নয় লালুদা, যে প্যান্টের সঙ্গে শু পরতেই হবে। তাছাড়া আপনি আমার নামটাই মনে রাখতে পারেন না, আপনি আমার জামা-কাপড় কিনে দেবেন কোন অধিকারে?

তোমার নাম মনে রাখতে পারি না? তোমার ওই যে কী বলে, কী বলে, নীলধ্বজ নয়।

নীপাবউদি বলল, ওর নাম নীললোহিত! শুধু নীলু বলেই তো ডাকতে পারেন।

লালুদা বলল, বড্ড খটোমটো নাম। নীললোহিত! এ নামের মানে কী?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, লালু মানে কী?

এইসময় দরজা ঠেলে একটা ঝড়ের মতো ঢুকল মুমু। একহাতে দোলাচ্ছে একটা এয়ারলাইনসের ব্যাগ, অন্য হাতে আইসক্রিমের কোন। মাত্র কয়েক মাস দেখিনি, তার মধ্যে যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে মুমু। ওর যে মাত্র তেরো বছর বয়েস, তা মনেই হয় না। একটা আগুনরঙের ফ্রক পরা, মাথার চুল ভিজে হিলবিলে হয়ে আছে।

অন্য কারুর দিকে নজর না দিয়ে সোজা চলে এল আমার কাছে। চোখ পাকিয়ে বলল, অ্যাই ব্লু; অ্যাতো দিন আসোনি কেন? কোথায় ডুব মেরেছিলে?

আমি বললাম, জনতার মধ্যে নির্বাসনে।

মুমু বলল, তার মানে?

আমি বললাম, স্কুলে বাংলার মিসকে জিজ্ঞেস করে মানেটা জেনে নিও।

মুমু খপ করে আমার কান ধরে মুলে দিয়ে বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে! পাজি। আনরিলায়েবল লায়ার।

নীপাবউদি হা-হা করে বলে উঠল, কী হচ্ছে মুমু! নীলু তোর চেয়ে কত বড়, তোর কাকা হয়, তার কান ধরছিস যে!

মুমু বলল, তুমি জানো না মা, আমাকে এ লিটুল প্রিন্স-এর গল্পটা অর্ধেক বলে তারপর বলল, তোকে বইটা দিয়ে যাব, নিজে পড়িস, কালকেই দিয়ে যাব। তারপর থেকে হাওয়া! আর এদিকে আসার নাম নেই। মিথ্যুক একটা!

লালুদা বলল, আহা, বেকার ছেলে, বই কেনার পয়সা কোথায় পাবে! কী বই, নামটা লিখে দিস, আমি এনে দেব।

চন্দনদা মুমুকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, জানিস মুমু, তোর নীলুকাকা এবার খুব জব্দ হবে। ওকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। প্রথম চাকরি পাওয়ার কথাটা শুনে এমন ভাব করল, যেন ওকে হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথাও।

আমি মুমুর দিকে ভুরুর ইঙ্গিত করে বললাম, মুমু, আমি ছোটপাহাড়ি যাচ্ছি। সেই ছোটপাহাড়ি, তোর মনে আছে?

মুমু খিল খিল করে হেসে উঠল।

আজ তপনদা বিশেষ কোনও কথা বলেনি। মুড নেই। অন্য সময় তপনদা কথা শুরু করলে অন্য কেউ পাত্তা পায় না। আজ মৃদু মৃদু হেসে সব শুনে যাচ্ছে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় দুটো চাটি মেরে গেয়ে উঠল, জয়যাত্রায় যাও গো…এক মাসের বেশি টিকে থেকো গো।

.

০২.

উন্নতি শব্দটার অনেকরকম মানে হতে পারে। একজন স্কুল মাস্টারকে যদি থানার দারোগা করে দেওয়া হয় কিংবা এক জন সন্ন্যাসীকে ধরে এনে যদি বসিয়ে দেওয়া হয় রাইটার্স বিল্ডিংসের কোনও বড়বাবুর চেয়ারে, কিংবা একটা ফুলের বাগানে যদি তৈরি হয় দশতলা বাড়ি, এসবও উন্নতি নিশ্চয়ই আবার ঠোঁট বেঁকাতেও হয়। একটা নিরিবিলি জংলা মতো জায়গা, দু'চারখানা মাত্র বাড়ি আর সরু পায়ে চলা পথ ছাড়া আর কিছুই নেই, আছে শুধু শান্তি ও সৌন্দর্য। সেই জায়গাটায় যদি শুরু হয়ে যায় এক কর্মকাণ্ড, জঙ্গল সাফ করে তৈরি হয় কারখানা, হাসপাতাল, হোটেল, অফিসবাড়ি, তাহলে সেটাও খুব উন্নতির ব্যাপার, কত লোক চাকরি পাবে, কত মানুষের আশ্রয় জুটবে। খুবই আনন্দের কথা। তবু আগেকার জন্য দীর্ঘশ্বাসও থেকে যায়।

ছোটপাহাড়ি এখন বড় হতে চলেছে। কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া গেছে লৌহ ধাতুপিণ্ড, তাই ছুটে আসছে ইস্পাত-বিশেষজ্ঞরা। এখানে এখন শহর হবে। বোধহয় এখন যেটা টাটানগর, সেটাও এক সময় ছোটপাহাড়ির মতোই ছিল। চন্দনদাদের কোম্পানিই এখানে অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শুরু করে দিয়েছে, দারুণ উদ্যমে দ্রুত তৈরি হচ্ছে বড় বড় বাড়িঘর। সেই রকমই একটা নির্মীয়মাণ কারখানায় মিস্তিরি-মজুরদের কাজের ওপর নজরদাবির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। অর্থাৎকুলির সর্দার। কাজটা আমার বেশ পছন্দের।

ছোটপাহাড়ি জায়গাটা বাংলা আর বিহারের সীমানায়। একটা ছোট্ট নদীর এ-পার আর ও-পার। এখানকার লোকরা হিন্দি-বাংলা দুটোই জানে। হিন্দি বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে নিখুঁত বাংলা বলে। সাঁওতালরাও নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিজেদের ভাষায়, আবার বাংলা যখন বলে, তাতেও যথেষ্ট সাবলীল। সুতরাং এখানে ভাষার ব্যাপারে আমার কোনও অসুবিধে নেই।

পাহাড়গুলোর পায়ের কাছে যে বিস্তীর্ণ বনতুলসীর ঝোপ, সে-দিকে এখনও হাত পড়েনি নগর নির্মাতাদের। আমি প্রতি দিন একবার সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরি, বুক ভরে ঘ্রাণ

নিই, চোখ ভরে ছবিটা রেখে দিই। ঠিক করে রেখেছি, বনতুলসীর ঝাড় কাটার কথা উঠলেই আমি এখান থেকে সরে পড়ব। ওদের প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হতে পারব না।

প্রথম দিন এসেই চন্দনদা বলেছিল, তুই আমার কোয়ার্টারে থাকতে পারিস নীলু, আবার নিজস্ব থাকার জায়গাও পেতে পারিস। আমার কোয়ার্টার যথেষ্ট বড়, তুই থাকলে কোনও অসুবিধে নেই, তবে স্বাবলম্বী হতে চাস যদি তাহলে আলাদা ব্যবস্থাও হতে পারে। তুই তো আবার দয়া-টয়া চাস না। প্রথম কয়েকটা দিন আমার এখানে খেয়ে নিবি, তারপর নিজেই রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করবি।

বলাই বাহুল্য, সর্বক্ষণ চন্দনদার অভিভাবকত্বের তলায় থাকার চেয়ে আমার আলাদা থাকাই পছন্দ। আমার জন্য কোনও কোয়ার্টার এখনও তৈরি হয়নি, তবে বড় যে-গেস্ট হাউসটি আছে, তার একটি ঘর বরাদ্দ হল। এই গেস্ট হাউসটি যখন সবে মাত্র তৈরি হচ্ছিল, এক তলার একখানা বড় ঘর ছিল বাসযোগ্য, তখন আমি মুমুকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে সাপ ঢুকে পড়েছিল, সে কী কাণ্ড! সে-দিন দারুণ ভয় পেয়েছিলাম, আজ ভাবতে মজা লাগে।

তখন হরিলাল নামে যে চৌকিদারটি ছিল, সে এখনও আছে। আগের মতোই সে সন্ধের পর মহুয়ার নেশা করে বোম হয়ে থাকে, অতি সরল ও নির্মল মানুষ। আমাকে দেখেই যে সে চিনতে পারল, তাতে আমি একেবারে অভিভূত। আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে সে দু'বছর আগে মাত্র একদিন থেকেই মনে রেখেছে।

আমার ঘরটা দোতলার এক কোণে। এই বাড়িটার খুব কাছেই একটা পাহাড়, মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যাবে। মাঝখানে অবশ্য একটা জঙ্গলও আছে। রাত্তিরে সেখানে শেয়াল ডাকে। শিগগিরই এই জঙ্গলটা কাটা হবে, তখন শেয়ালগুলো যাবে কোথায়?

এখানে খাবার ব্যবস্থা হয়নি এখনও। দু'তলায় রয়েছে দুটো রান্নাঘর, ব্যবহার করতে পারে অতিথিরা, কিংবা বাইরে হোটেলেও খেয়ে আসতে পারে। অতিথি প্রায় থাকেইনা।

সারা বাড়িটাই আমার এখন একার বলা যায়। সকালবেলায় চা, ডিম-টোষ্ট কিংবা পুরি-ভুজি হরিলালই বানিয়ে দেয় আমার জন্য। চন্দনদা এক হাজার টাকা অ্যাডভান্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এখন আমি ইচ্ছেকরলে প্রত্যেক দিন ডাবল ডিমের ওমলেট খেতে পারি। এখন আমি বড়লোক, সবসময় পকেটে খচমচ করে টাকা। এত টাকা নিয়ে মানুষ কী করে? ছোটপাহাড়িতে টাকা খরচ করার কোনও রাস্তাই নেই। না আছে সিনেমা থিয়েটার, না আছে ভাল রেস্তোরাঁ কিংবা ডিস্কো নাচের ব্যবস্থা।

আমাদের জন্য কিছু নেই, কিন্তু মজুর কামিনদের জন্য অনেক কিছুই আছে। মহুয়ার দোকান, চুল্লুর ঠেক, জুয়ার আড্ডা। ওদের পয়সা খলখলিয়ে চলে যায়। রাত্তিরবেলা ওরা নাচে, গায়, ফুর্তি করে, আর সন্ধের পর থেকে আমাদের কিছুই করার থাকে না। সময় কাটাবার জন্যই আমি রাত্তিরে নিজে রান্না শুরু করেছি, দিনেরবেলা হোটেলে খেয়ে নিই।

সকাল ন'টা থেকে ছ'টা পর্যন্ত আমার আপিস। একটা সুবিধে এই যে, গেস্টহাউসে দুটো বারোয়ারি সাইকেল আছে। এখানে তো আর ট্যাক্সি-বাস-রিক্সা পাওয়া যাবেনা, অফিসারদের নিজস্ব গাড়ি বা জিপ আছে, আমার মতো ক্লাস থ্রি স্টাফদের সাইকেলই সম্বল। আমার কাজের জায়গাটা প্রায় দেড় মাইল দূরে, তৈরি হচ্ছে একটা লম্বাটে দোতলা বাড়ি, সেটা হবে লেবরেটারি। গাঁথনি ও ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন চলছে ভেতরের কাজ। এই সময়েই নাকি মিস্তিরি মজুরেরা কাজে ঢিলে দেয়, খুচখাচ করে সারা দিনে কী যে করে বোঝা যায় না।

সাইকেল চালিয়ে ঠিক নটার সময় আমি সেখানে হাজির হই। কাজটা খুব সোজা। প্রথমে একটা লম্বা খাতা দেখে মিস্তিরি-জোগাড়ে কামিনদের নাম হাঁকি। ব্যাস, তারপর আর করার কিছু নেই, শুধু কয়েক বার এক তলা দোতলায় চক্কর মারা ছাড়া। চন্দনদার স্পষ্ট নির্দেশ আছে, কুলি-মজুরদের কোনওক্রমেই বকাবকি করা চলবে না। বকলে ওদের মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, তখন নানা উপায়ে তারা ফাঁকি মারার ফিকির খুঁজবে। বরং তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করলে তাদের মন ভাল থাকে, কাজে বেশি উৎসাহ পায়। ঠিক সাড়ে বারোটায় বাজিয়ে দিতে হবে ঘণ্টা, এরপর থেকে দু'ঘণ্টা টিফিনের ছুটি।

এই দু'ঘণ্টা ছুটির ব্যাপারটায় মিস্তিরি-মজুরেরা নিজেরাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। পুরো দিনের মজুরি পেয়েও দু'ঘণ্টা ছুটি। এ-রকম তারা আগে কখন দেখেনি। কিন্তু চন্দদার থিয়োরি হচ্ছে, অফিসের কেরানিবাবুরা যদি টিফিনের নামে দু'ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতে পারে, তাহলে মিস্তিরি-মজুররা, যারা শারীরিক পরিশ্রম করে, তাদের টিফিনের ছুটির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। একটানা ঘন্টার পর ঘণ্টা কাজ করলে কাজের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। দু'ঘণ্টা টিফিনের মধ্যে আধ ঘণ্টা ওরা খাবার-দাবার খেয়ে নেবে, বাকি দেড় ঘণ্টা ঘুমোবে কিংবা গড়াবে। তারপর আবার ছ'টা পর্যন্ত কাজ।

এখন কাজ করছে সেই আঠারো জন নারী-পুরুষ। এরা আমাকে ছোটবাবু বলে ডাকতে শুরু করেছে। আমি ছোটপাহাড়ির ছোটবাবু। একমাত্র হেড মিস্তিরি ইরফান আলি গম্ভীর ধরনের মানুষ, যে আমাকে বাবু বলে না। তার হাতে একটা দামি ঘড়ি। আমি ঘড়িই পরিনা, সেই জন্য সে নিজেকে আমার তুলনায় উচ্চশ্রেণির মানুষ মনে করে।

ছুটির পর আমি সাইকেল চালিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাই। এক-এক দিন ভোরবেলাতেও চলে আসি। ছোট্ট নদীটা পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ছলোচ্ছল শব্দ করে। আমি জলে পা ডুবিয়ে বসি। এই সময় নিজেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি বলে মনে হয়। জলের ওপর ঝুঁকে পড়া গাছপালা আর নদীর সঙ্গে অনায়াসে কথা বলতে পারি।

আমার চাকরির এই সময়টাই সব চেয়ে উপভোগ্য। দূরগ্রামের আদিবাসীরা এ-দিক দিয়ে যাবার সময় এক ঝলক তাকায়, আমার প্রতি তারা কোনও কৌতূহল প্রকাশ করে না।

এখান থেকে কলকাতায় যেতে খানিকটা বাসে আর বাকিটা ট্রেনে, সাড়ে ছ'ঘণ্টার বেশি লাগে । তবু মনে হয় যেন কলকাতা কয়েক লক্ষ মাইল দূরে। এখানে এখনও যান্ত্রিক শব্দের তেমন উৎপাত নেই, আর সন্ধের পর যে-নিস্তব্ধতা তা যেন সভ্যতার আগেকার কালের।

আমি কলকাতাকে খুবই ভালবাসি, কিন্তু একটানা বেশি দিন থাকতে পারি না। মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ না হলে প্রেম জমে না।

কলকাতায় থাকার সময় পাহাড়-নদী-জঙ্গলের জন্য মনটা হু-হু করে। আবার অনেকদিন কোনও নিরালা-নিরিবিলি জায়গায় কাটাবার পর আবার কলকাতা মন টানে। এক সঙ্গে দুটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা খুব বিপজ্জনক, কিন্তু প্রকৃতি ও নগরী, এই দুজনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রেম চালিয়ে যাওয়া সত্যিকারের আনন্দের।

রাত্তিরবেলা দূর থেকে শোনা যায় মাদলের ধ্বনি। কোনও আদিবাসী গ্রামে উৎসব চলে। আমাদের কামিন-মজুররা সবাই স্থানীয়, অনেকে প্রত্যেক দিন নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়, আবার অনেকে এখানেই ঝুপড়ি বানিয়েছে, সেখানেও তারা নাচ-গান করে প্রায়ই।

একদিন রাত আটটার সময় চন্দনদার বাংলোর পাশ দিয়ে ফিরছি, দেখলাম অনেক আলো জ্বলছে, কয়েকজন লোকের গলার আওয়াজ, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন-চারটে গাড়ি পার্টি চলছে, আমার নেমন্তন্ন হয়নি।

চন্দনদা প্রথম দিনই আমাকে আলাদা থাকার ইঙ্গিত কেন দিয়েছিলেন, তা এর মধ্যেই বুঝে গেছি। আমার স্বাধীনতার জন্য নয়, নিজের পদমর্যাদার কারণে। চন্দনদা ক্লাস ওয়ান অফিসার, এখানকার বড় সাহেব, তার বাড়িতে আমার মতো এক জন ক্লাস থ্রি স্টাফের থাকাটা মানায় না। চন্দনদার বাড়িতে তার কাছাকাছি তুল্য অফিসার এবং বড় বড় কন্ট্রাকটররা প্রায়ই আসবে, সেখানে আমার মতো এক জনকে ঘুর ঘুর করতে দেখলে তারা অবাক হবে, চন্দনদাও আমার পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে। চাকরি না করে আমি যদি বেকার হতাম, তাহলে কোনও অসুবিধে ছিল না, চন্দনদা অনায়াসে বলতে পারত, এ আমার এক জন ভাই, ক'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। কিন্তু ক্লাস থ্রি স্টাফ কখনও ক্লাস ওয়ান অফিসারের ভাই হতে পারে না।

আমার ঠিক ওপরের বস চন্দনদা নয়, মহিম সরকার। তিনি কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার। আরও দুটো বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে, মহিমবাবু সেখানেই ব্যস্ত থাকেন, আমার

জায়গাটায় বিশেষ আসেন না। হঠাৎ কখনও একটা চক্কর দিয়ে যান। আমাকে তিনি এ বাড়িটার একটা নীল নক্সা গছিয়ে দিয়েছেন, লিনটেন, প্যারাপেট, প্লামবিং, ফ্লোর পালিশ এই সব বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তা আমার মাথায় ঢকেনি। বোঝার দরকারটাই-বা কী, ও-সব তো মহিমবাবুর কাজ। আমার ওপর দায়িত্ব মজুররা কাজের সময় ফাঁকি মারছে কি না সেটা দেখা, কী কাজ করবে তা ওরাই জানে।

চন্দনদা আমাকে নেমন্তন্ন করেনা বটে, কিন্তু নিজে এক-একদিন সন্ধেবেলা আমার গেস্ট হাউসে এসে হাজির হয়। রান্নাঘরে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করে, কী করছিস রে, নীলু?

আমার মুখে চন্দনের ফোঁটার মতো ঘাম, গেঞ্জিটাও ভিজে গেছে। পাকা রাঁধুনির মতো গরম কড়াইতে তেল ঢেলে বললাম এই তো ডিমের ঝোল রাঁধছি। এরপর ভাত চড়াব।

চন্দনদা বলল, ডিমের ঝোল, বাঃ, বেশ ভাল জিনিস। ক’টা ডিম নিয়েছিস?

দুটো। তুমি একটা চেখে দেখবে নাকি?

কাল কী বেঁধেছিলি?

ডিম সেদ্ধ আর ডাল।

পরশু?

ডাল আর ডিমভাজা।

রোজ রোজ ডিম খাচ্ছিস, তোর পেট গরম হয়ে যাবে যে! এখানে মুরগি বেশ শস্তা, একেবারে ফ্রেস দিশি মুরগি, তুই মুরগির ঝোল রাঁধতে জানিস না?

রাঁধতে বেশ ভালই পারি চন্দনদা, কিন্তু একটা গোটা মুরগি রাঁধলে খাবে কে? যত ছোটই হোক, পুরো একটা মুরগি খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে ফ্রিজও নেই যে রেখে দেব।

বলিস কী, তোর সাতাশ বছর বয়স, একটা আস্ত মুরগি খেতে পারবিনা। আমরা তো ওই বয়েসে দু'তিনটে মুরগি উড়িয়ে দিতে পারতাম।

তোমাদের ছেলেবেলায় নানা রকম অসম্ভব কাজ করতে পারতে, তা জানি। কিন্তু আমার পক্ষে দু-তিন পিসই যথেষ্ট। বাজারে তো কাটা-পোনার মতো কয়েক পিস মুরগির মাংস কিনতে পাওয়া যায় না।

তার মানে, যারা একা থাকে, তারা মুরগির মাংস রান্না করে খেতে পারবে না? যারা বিবাহিত, কাচ্চা-বাচ্চাওয়ালা সংসারী লোক, তারাই শুধু মুরগি খাবে? এ তো ভারি অন্যায়, অবিচার। তাহলে তুই কী করবি, একটা বিয়ে করে ফেলবি নাকি?

বিয়ে করার চেয়ে ডিমের ঝোল খাওয়া অনেক সহজ নয়?

সেটা অবশ্য মন্দ বলিসনি। তাহলে?

চন্দনদা যেন এক গভীর সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমি ডিমের ঝোল রেঁধে বেশি করে ভাত চাপালাম। আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে চন্দনদা ঘুমিয়েই পড়ল এক সময়।

ডাইনিং রুমে দুটো প্লেট সাজিয়ে আমি ডেকে তুললাম চন্দনদাকে।

ঝোল দিয়ে ভাত মেখে এক গেরাস খেয়ে চন্দনদা বলল, তুই তো বেশ ভালই রান্না শিখেছিস নীলু। নীপার চেয়ে অনেক ভাল।

অর্ধেকটা খাবার পর হঠাৎ থেমে গিয়ে, আর্কিমিডিসের আবিষ্কারের ভঙ্গিতে চন্দনদা বলে উঠল, যাঃ, আর একটা উপায়ের কথা আমার এতক্ষণ মনেই পড়েনি। আমিই তো একটা মুরগি নিয়ে এলে পারি। তুই সেটা রান্না করবি। দুজনে মিলে একটা মুরগি শেষ করতে

তো অসুবিধে নেই। তুই ওয়ান ফোর্থ, আমি না হয় থ্রি ফোর্থ খাব! তুই দিনের পর দিন মুরগি না খেয়ে থাকবি, তা তো ঠিক নয়।

তোমাকে আনতে হবে না, আমিই তোমাকে এক দিন মুরগি রেঁধে খাওয়াব।

কেন, আমাকে আনতে হবে না কেন? তুই ক'পয়সা মাইনে পাস যে আমাকে খাওয়াবি? প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই অর্ধেকটা পাঠিয়ে দিবি মাসিমাকে। হরিলাল, হরিলাল!

ও কী, হরিলালকে ডাকছ কেন।

ওকে দিয়ে মুরগি আনাব।

এখন? আমাদের তো খাওয়া হয়ে গেল।

ধুৎ। মাছ-মাংস না থাকলে কি পুরো খাওয়া হয়? ডিম-টিমগুলো মনে হয় জলখাবার!

রক্ষে করো চন্দনদা। ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি মুরগি রান্না করতেও পারব না, খেতেও পারব না। আর এক দিন হবে।

তোরা এত কম খাস বলে তোদর মনের জোরও কম। তাহলে কালই...ও হ্যাঁ, ভাল কথা, আর একটা খবর তোকে দেওয়া হয়নি। মুমু-নীপারা সবাই এখানে বেড়াতে আসতে চাইছে। এখন এত কাজের সময়।

কবে আসবে?

চব্বিশ তারিখ থেকে মুমুর কয়েক দিন ছুটি আছে। ওই লালুটাও বোধহয় আসবে ওদের সঙ্গে।

লালুদা আসবেই।

কেন, আসবেই কেন?

লালুদা এখানে এসে তোমার, আমার, নীপাবউদির নানা রকম উপকার করার সুযোগ ছাড়বেনা। পরোপকার করা যে ওর নেশা।

ও পুরুষদের জন্য কিছু করে না। শুধু মেয়েদের।

আমার জন্য যে জামা-জুতো কিনে দিতে চাইছিল?

নীপা সামনে ছিল বলে। নীপাকে ওর টাকার গরম দেখাতে চাইছিল। যাই হোক, লালুটা যদি এসে পড়ে, ওকে আমার বাংলোতে রাখবনা। এ গেস্ট হাউসে ব্যবস্থা করে দেব। তুই যেন তখন লালুকে রেঁধে খাওয়াতে যাসনি!

সে প্রশ্নই ওঠেনা। নীপাবউদি এলে আমি জোর করে প্রত্যেক দিন তোমার বাড়িতে খেতে যাব। তুমি না ডাকলেও যাব।

এই সময় দূরে দ্রিদিম দ্রিদিম করে মাদল বেজে উঠল।

খাওয়া থামিয়ে চুপ করে গেল চন্দনদা।

একটু বাদে বলল, এই আওয়াজটা শুনলে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ছোটবেলায় আমরা দুমকায় থাকতাম, সেই সময়কার কথা মনে পড়ে।

আমি বললাম, যত রাত পর্যন্ত শোনা যায়, আমি জেগে থাকি।

চন্দনদা বলল, আমি যা কাজ করি, আমার পক্ষে রাত্তিরবেলা ওদের গান-বাজনার আসরে গিয়ে বসাটা আমার ঠিক মানায় না। তুই তো গেলেই পারিস, সন্ধেবেলা একা একা থাকিস।

এই কথাটা আমারও মনে হয়েছে। এক দিন অন্ধকারে ওই বাজনা লক্ষ্য করে যেতে হবে।

আমার আন্ডারে যে আঠারো জন কাজ করে তাদের মধ্যে রাজমিস্তিরিরা মুসলমান, জলের পাইপ বসাবার কাজ যারা করে তারা ওড়িশার হিন্দু আর জোগাড়েরা সাঁওতাল। এরা একসঙ্গে কাজ করে বটে, কিন্তু টিফিনের সময় আলাদা আলাদা বসে। তিনটে দলের তিন রকম খাবার। ঘুমোয় খানিকটা দূরত্ব রেখে।

এদের কারুর সঙ্গে আমার এখন তেমন ভাব হয়নি। ভাব জমাতে আমার দেরি লাগে। ওদের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে যাই, দুটো একটা কথা বলি, ওরাও দু-একটা উত্তর দেয়। রাজমিস্তিরি ও কলের মিস্তিরিরা এই ছোটপাহাড়িতেই ঝুপড়ি করে আছে, সাঁওতালরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়। ওদের এক জনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা কোন গ্রামে থাকে? সে হাত তুলে দিগন্তের দিকে দেখিয়ে বলেছিল, সিই-ই খানে!

হয়তো ওদেরই গ্রামে মাদল বাজে। এখানে ওরা চুপচাপ কাজ করে যায় সারা দিন, সন্ধের পর গ্রামে যখন নাচ-গান করে, তখন ওদের চেহারা নিশ্চয়ই বদলে যায়।

সাঁওতালদের একটি মেয়ে ভারি অদ্ভুত। মেয়েটিকে আমি কখনও কথা বলতে শুনিনি। একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। বোবা? সে সবসময় দূরে দূরে একা থাকে। টিফিনের সময় অন্যরা খাওয়ার পর যখন ঘুমোয়, তখনও সে শোয় না, খানিক দূরে হাঁটুতে থুতনিত ঠেকিয়ে বসে থাকে। খুবই রোগা চেহারা, মুখখানাও সুন্দর নয়। একটা শীর্ণ ভাব আছে বলেই চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে। সবসময় এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দূরের দিকে।

বোবারা কানেও শুনতে পায় না। এই মেয়েটিকে অন্যরা ফুলমণি ফুলমণি বলে ডাকে, এ তখন মুখ ফেরায়। মিস্তিরি কখন ইট আনতে হবে, কখন বালি, তা বলে দিলেও বোঝে। ওই রোগা চেহারা নিয়েও ফুলমণি মাথায় অনেকগুলো ইট নিয়ে উঠে যায় বাঁশের ভারা দিয়ে, সেকাজে ওর গাফিলতি নেই। কিন্তু টিফিনের সময় অন্য তিনটি সাঁওতাল মেয়ে কল কল করে হাসে, এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে, কখনও দু-এক লাইন গানও গেয়ে ওঠে, সে-দিকে ফুলমণি ভ্রূক্ষেপও করে না। সে চেয়ে থাকে অন্য দিকে। অনেক সময় সে মাটিতে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটে।

অনবরত চক্কর দেবার কোনও মানে হয় না, তাই মিস্তিরি-মজুররা যখন কাজ করে তখন আমি একটা চেয়ারে বসে বই পড়ি। আমার উপস্থিতিটাই যথেষ্ট। এদের ফাঁকি দিতেও দেখিনি কখনও। বাইরে ফট ফট করছে রোদ, কিন্তু গরম নেই তেমন। চুন-সুরকির গন্ধও আমার খারাপ লাগে না। চাকরিটা আমি উপভোগ করছি বলা যায়।

একদিন দুপুরবেলা মহিমবাবু এসে হাজির। বিকেলে দু'লরি সিমেন্ট আসবে, আমাকে বস্তাগুলো গুনে রাখতে হবে, এই নির্দেশ দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি বললেন, এ কী, আপনি বই পড়ছেন?

যেন বই পড়াটা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! চাকরি করতে এসে দুপুরবেলা চোখের সামনে বই খুলে রাখা মহাপাপ!

মহিমবাবু এক দিন বিকেলে আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। উনি গত দেড় বছর ধরে পাকাপাকি আছেন ছোটপাহাড়িতে। সস্ত্রীক, বাচ্চা-কাচ্চা নেই, ওঁদের কোয়ার্টারটা বেশ ভালই, আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শয়নকক্ষ, বাথরুম, রান্নাঘর পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ঘরেই একটাও বই বা পত্র পত্রিকা চোখে পড়েনি।

যারা নিজেরা বই পড়ে না, তারা অপরের বই পড়াটাও যেন শারীরিকভাবে সহ্য করতে পারে না। মহিমবাবু এমন ভাবে আমার বইখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন ওঁর গা চুলকোচ্ছে।

প্রথম দু-এক দিনেই বুঝে গেছি যে, মহিমবাবু আমাকে পছন্দ করতে পারেননি। আমি পছন্দ বা অপছন্দ কোনওটারই যোগ্য নই। এখানে আমাকে উপরন্তু অপছন্দ করার কারণ, আমি বড়সাহেবের লোক। বড়সাহেব কলকাতা থেকে তার এক আত্মীয়কে এনে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মহিমবাবুর কোনও শালা বা ভাইপো নিশ্চয়ই বেকার বসে আছে, তিনি তার কথা ভেবে বসেছিলেন। আমি মনে মনে বলি, অপেক্ষা করুন। মহিমবাবু, ধৈর্য হারাবেন না, আপনার শালা কিংবা ভাইপো ঠিকই চাকরি পাবে।

সে-দিন মহিমবাবুকে খাতির দেখাবার জন্য আমি বইটা নামিয়ে রেখেছিলাম। দু-দিন পর উনি আবার এলেন দেড়টার সময়। এখনও টিফিন টাইম শেষ হয়নি, এখন আমি যা খুশি করতে পারি।

ওঁকে দেখে মিষ্টি হাসি দিয়ে বললাম, কী ভালো? বই পড়তে লাগলাম আবার। জর্জ সিমেনোর রহস্য কাহিনি, অতি পাষণ্ড ছাড়া এই বই শেষ না করে কেউ উঠতে পারে না। চন্দনদার বাড়িতে এ-সব বইয়ের প্রচুর স্টক আছে।

মহিমবাবু ভুরু কুঁচকে উঠে গেলেন দো-তলায়। খানিক বাদে আমার মনঃসংযোগ নষ্ট হল। ওপরে কীসের যেন একটা গোলমাল হচ্ছে। মহিমবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, মি. নীললোহিত, মি. নীললোহিত, একবার ওপরে আসুন তো।

ক্লাস থ্রি-স্টাফেরা যেমন টাই পরেনা, তেমনি তারা মিস্টারও হয় না। আর নীললোহিত নামটার আগে মিস্টার কখনও মানায়? যাদের বাড়িতে একখানাও বই থাকে না, তাদের কাণ্ডজ্ঞান তো এ-রকম হবেই।

টিফিনের সময় ডাকাডাকি খুব অন্যায়। চন্দনদার নীতি-বিরোধী। মহিমবাবু কর্ম-প্রাণ পুরুষ। বিশ্রাম কাকে বলে জানেন না কিংবা ওপরওয়ালাদের তিনি বেশি বেশি কাজ দেখাতে চান। এখানে তো ওপরওয়ালা কেউ নেই!

উঠে এলাম ওপরে। মহিমবাবু যদি দো-তলা থেকে ডাকার সময় মিস্টার যোগ না করে শুধু আমার নাম ধরে ডাকতেন, তাহলে ওকে বেকায়দায় ফেলার কোনও ইচ্ছে আমার জাগত না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমার মনে হল, মহিমবাবুকে ছোট্ট একটি লেংগি মারা দরকার। সহকর্মীদের সঙ্গে লেংগি মারামারি না করলে আর চাকরির সুখ কী?

মহিমবাবু বললেন, দেখুন দেখুন, আপনি নজর রাখেন না, নাকের ডগায় বই নিয়ে বসে থাকেন, এদিকে এরা কী করে?

আমি নিরীহ ভাবে বললাম, কী করেছে?

মহিমবাবু বললেন, ডিউটি আওয়ার্সে ফাঁকি! ওয়েস্টেজ অফ মেটিরিয়ালস।

হেড মিস্তিরি ইরফান আলি দাঁড়িয়ে আছে মহিমবাবুর পাশে। তার হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে আমি বললাম, ডিউটি আওয়ার্স তো এখনও শুরু হয়নি।

কোম্পানির জিনিস নষ্ট করছে, সেটা দেখছেন না?

কী নষ্ট করেছে?

দেয়ালটার দিকে তাকান একবার। ওপরে কি একবারও আসেন না?

মহিমবাবু নিজেই দেয়ালটা আড়াল করে আছেন, দেখব কী করে? এবার কাছে গিয়ে দেখলাম, দেয়ালে আঁকা রয়েছে একটা ছবি। দোতলায় দেয়ালগুলো প্লাস্টার করা হয়েছে কয়েক দিন আগে, এখন হোয়াইট ওয়াশ করা হয়নি। দু-এক দিনের মধ্যে হবার কথা।

চুন গোলা দিয়ে কেউ একটা আঁকাবাঁকা ছবি এঁকেছে দেওয়ালে। একটা গাছ, একটা ছেলে, একটা কুকুর। কাঁচা হাতের কাজ। দুদিন বাদে যে-দেওয়াল চুনকাম হবে, সেখানে একটা ছবি এঁকে রাখলে ক্ষতি কী, পরে তো মুছেই যাবে।

আমি বললাম, টিফিনের আগেই আমি একবার ওপরে ঘুরে গেছি। তখন ছিল না। টিফিনের মধ্যেই কেউ এঁকেছে।

আমার কথা গ্রাহ্য না করে মহিমবাবু গলা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কে এ কাজ করেছে? কৌন কিয়া?

ইরফান আলি নিজস্ব দলটার দায়িত্ব নিয়ে বলল, হামলোগ নেহি দেখা!

কলের মিস্তিরিরা বলল, আমরা কিছু দেখি নাই। আমরা বারান্দায় ছিলাম।

সাঁওতালরা কোনও উত্তর না দিয়ে কয়েকজন চুপ করে রইল, কয়েক জন মিচকি মিচকি হাসতে লাগল।

এবার এগিয়ে এল এক নিঃশব্দ প্রতিমা। ফুলমণি। তার হাতে একটা ভিজে ন্যাতা।

মহিমবাবু এবার তার গলায় বিস্ময় আর রাগ এক সঙ্গে মিশিয়ে বললেন, তুম কিয়া? কহে কিয়া? অ্যাঁ? কাহে কিয়া?

আমি ফুলমণিকে নতুন চোখে দেখলাম। এই বোবা মেয়েটা ছবি আঁকে? আগে ওকে মনে হত বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি।

যে বাড়ি এখনও তৈরি হয়নি, রঙ করা হয়নি, তার দেয়ালে দু-চারটে ছবি-টবি থাকা তো দোষের কিছুনা। আমার ছবি আঁকার ক্ষমতা থাকলে আমিই আঁকতাম। শুধু বালি, বালি রঙের দেয়াল দেখার কী আছে?

আমি ভেবেছিলাম, নারী জাতির প্রতি সমবোধে মহিমবাবু গলার আওয়াজটা অদ্ভুত একটু নরম করবেন। তা নয়, খুব রোগা এক অবলাকে দেখে তিনি আরও গর্জন করে বলতে লাগলেন, মুছে দেও, আভি মুছে দেও!

যদি একটি মুখরা মেয়ে হত, তাহলেও অন্য কথা ছিল। কিন্তু এক জন বোবা, তার প্রতি এ-রকম একতরফা বাক্য ব্যবহার আমার পছন্দ হল না।

আমি হাত তুলে বললাম, দাঁড়াও, ওটা মুছতে হবে না।

মহিমবাবু আমার ওপরওয়ালা। তিনি হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, অ্যাঁ? কী বললেন?

আমি এই বাড়িটার ইনচার্জ। আমার মতামত না দিয়ে মহিমবাবু এখানে কোনও হুকুম দিতে পারেন না। আমার গলায় যথোচিত গাম্ভীর্য এনে আমি অন্যদের দিকে তাকিয়ে

বললাম, যত দিন না চুনকাম হয়, তত দিন তোমরা যে-কোনও দেওয়ালে যা ইচ্ছে ছবি আঁকতে পারো। টিফিন টাইমে!

তারপর মহিমবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব বিনীত ভাবে বললাম, এটাই চন্দনদার নির্দেশ। চন্দনদা খুব ছবি ভালবাসেন। উনি নিজে এক সময় দারুণ ছবি আঁকতেন, জানেন না?

৩-৪. মুরগি রান্না

চন্দনদাকে নিয়ে আর পারা যায় না! সন্ধেবেলা যে-মুরগিটা নিয়ে এল, পালক ফালক ছাড়াবার পরও সেটার ওজন দেড় কিলোর কম নয়। এত বড় একটা মুরগি রান্নার জন্য তেল-মশলা-আলু পেঁয়াজ জোগাড় করা কি সোজা কথা? তাছাড়া এত মাংস খাবে কে?

চন্দনদা বলল, তুই রান্না কর, দেখবি খাওয়ার লোকের অভাব হবে না। হরিলাল, শিবলাল, যাদবলাল, কত আছে! দুমকায় আমার দাদু কী বলতেন জানিস? বিরাশি বছর বয়স, তবু রোজ মাছ চাই, মাংস চাই, তিন রকম তরকারি চাই। সব সাজিয়ে দেওয়া হত, নিজে কিন্তু কিছুই খেতেন না। একটু একটু ছুঁয়ে উঠে পড়তেন। আর বলতেন, আমার টাকা আছে, আমি হুকুম করব সব রান্না হবে, তাতে আমার নাতি-নাতনিরা ভাল করে খেতে পাবে।

আমি বললাম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার বাংলোতে বাবুর্চি আছে, তাকে দিয়ে না রাঁধিয়ে শুধু শুধু আমাকে খাটাচ্ছ কেন?

চন্দনদা বলল, আরে দুর দুর, বাবুর্চির হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে জিভ পচে গেছে। তোর এখানে খেলে বেশ একটা পিকনিক পিকনিক ভাব হয়।

আমি মনে মনে বললাম, দেখাচ্ছি মজা! আজ ভাতের তলা ধরিয়ে দেব ডালে নুন দেব দু'বার, আর মাংসে এমন ঝাল দেব যে, কাল সকাল পর্যন্ত হু-হু করে জ্বলবে।

আমার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চন্দনদা বলল, এক-এক সময় মনে হয়, জীবনটা যদি গোড়া থেকে শুরু করা যেত। তোর মতো এই রকম একটা ঘরে থাকতাম, নিজে রান্না করে খেতাম, ইচ্ছে না হলে দু'দিন দাড়ি কামাতাম না! সন্ধের সময় নিজের বাংলোতে থাকি না কেন জানিস? বাড়িতে থাকলেই অন্য অফিসাররা চলে আসে, এসেই অফিসের গল্প শুরু করে। সব সময় অফিসের গল্প!

হঠাৎ আবার উঠে বসে বলল হ্যাঁ, ভাল কথা। মহিমবাবু তোর নামে কী যেন বলছিল! তুই কী করেছিস?

এই রে। তুমিও তো অফিসের গল্প শুরু করলে!

না না, মহিমবাবু তোর নামে অভিযোগ করছিল। তুই নাকি ওয়ার্কারদের লাই দিচ্ছিস, তারা কাজে ফাঁকি দেয়।

এসব কথা কাল আলোচনা করলে হয় না?

তোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি মহিমবাবুর?

চন্দনদা, তুমি এক সময় গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলে না?

হ্যাঁ। কে বলল তোকে?

তোমার প্রাণের বন্ধু তপনদার কাছ থেকে শুনেছি। তুমি বহরমপুর থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিলে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চান্স পেয়েও ভর্তি হয়েছিলে আর্ট কলেজে। তোমার বাবা খবর পেয়ে এসে কান ধরে, তোমাকে টানতে টানতে শিবপুরে নিয়ে গিয়েছিল।

কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তপনের বানানো, না তুই বানালি? আমার বাবার চোখরাঙানিটা আমি যথেষ্ট ভয় পেতাম। বাবা দুঁদে উকিল ছিলেন।

বাবার ভয়ে তুমি ছবি আঁকা ছেড়েই দিলে? ইঞ্জিনিয়ার হলে বুঝি আর শিল্পী হওয়া যায় না? অনেক ইঞ্জিনিয়ার তো কবিতা লেখেন। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত…।

আমার কাজটা যে বড্ড ঝামেলার। চাকরিতে জড়িয়ে পড়ার পর আর চর্চা রাখতে পারিনি।

নীপাবউদির কাছে তোমার আঁকা কয়েকটা ছবি আমি দেখেছি। নীপাবউদির ইচ্ছে সেগুলো বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে। কিন্তু তুমি…।

আরে দুর, দুর, সেগুলো খুব কাঁচা ছবি। লোকে দেখলে হাসবে!

নীপাবউদির একখানা স্কেচ তুমি বেশ ভালই এঁকেছ। দেখলে চেনা যায়।

আমি ঠিক পঁয়তিরিশ সেকেন্ডে মানুষের মুখ আঁকতে পারতাম। একটানে। কিন্তু, কিন্তু, তুই কথা ঘোরাচ্ছিস রে নীলু? মহিমবাবু তোর নামে নালিশটা করেছে, আমি এসেছি তার বিচার করতে।

মহিমবাবু তোমাকে আসল কথাটাই বলেননি।

আসল কথাটা কী শুনি?

আমার ওখানে যারা কাজ করে, তাদের মধ্যে একটা আদিবাসী মেয়ে দেওয়ালে একটা ছবি এঁকেছে, তাতে মহিমবাবুর আপত্তি। আমি ভাবলাম, ছবিটা তোমাকে একবার দেখাব।

ছবি এঁকেছে মানে কী? ফিগার ড্রয়িং আছে?

হ্যাঁ, একটা ছোট ছেলে, একটা কুকুর।

রিয়েলিস্টিক? নাকি বাচ্চারা যে-রকম আঁকে, কিংবা মধুবনী স্টাইলের।

রিয়েলিস্টিক, মানে, ছেলেটাকে ছেলে বলে চেনা যায়, কুকুরটা অবিকল কুকুর। ব্যস্তভাবে খাট থেকে নেমে চন্দনদা বলল, চল তো, চল তো, আমি এ পর্যন্ত কোনও আদিবাসীর আঁকা রিয়েলিস্টিক ছবি দেখিনি।

এখন এই রাত্তিরে যাবে নাকি? কাল সকালে।

চল দেখে আসি। এমন কিছু রাত হয়নি।

রান্নাবান্না?

সে-সব পরে হবে। জামাটা পরে নে।

জিপ এনেছে চন্দনদা, ড্রাইভারকে ছুটি দিয়েছে, নিজেই চালাবে। আজ অন্ধকার নেই, ফট ফট করছে জ্যোৎস্যা। বাতাসে সেই জ্যোৎস্নার সুঘ্রাণ।

এখনও মাদল বাজেনি, আর কোনও শব্দ নেই, জিপের আওয়াজটাকেই মনে হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র আওয়াজ। আকাশ এত পরিষ্কার যে, ছায়াপথ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

লেবরেটরি বাড়িটায় এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। একটা গুদাম ঘরে সিমেন্ট জমা থাকে, তার জন্য এক জন পাহারাদার থাকার কথা, কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

চন্দনদার হাতে একটা তিন ব্যাটারির লম্বা টর্চ। আমরা উঠে এলাম দোতলায়। দেয়ালটার ঠিক জায়গায় টর্চের আলো পড়তেই চন্দনদা বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠল।

চতুর্দিকে অন্ধকার, টর্চের জোরালো আলোয় ছবিটা স্পষ্ট দেখা গেল, দিনেরবেলার চেয়েও ভাল মনে হল।

চন্দনদা দু' পাশ থেকে ছবিটা দেখে বলল, তুই ঠিক বলছিস নীলু, এটা কোনও আদিবাসী মেয়ের আঁকা?

হ্যাঁ। মেয়েটা পিকিউলিয়ার। কানে শুনতে পায়, কথা বলে না।

এ যে পাকা হাতের কাজ। সামথিং ইউনিক। আদিবাসীরা রিয়েলিস্টিক ছবি, যাকে বলে ফটোগ্রাফিক রিয়েলিস্টিক, সে-রকম আঁকতে পারে বলে জানা নেই। এখানে দেখ, যে-ছেলেটাকে এঁকেছে, তার ফিগারটা পুরোপুরি প্রোপোরশানেট। তারমানে শরীরের সঙ্গে

হাত-পা, মুখের সাইজ একেবারে ঠিক ঠিক। খানিকটা ট্রেইনিং না থাকলে তো এ-রকম আঁকা যায় না।

মেয়েটাকে দেখে মনে হয়, ও কিছু জানে না।

তা তো হতে পারে না। ভাল করে দেখ ছবিটা। গাছতলায় একটা ছেলে বসে আছে, এক জন রাখাল, হাতে একটা বাঁশি। সাধারণত এই ছবি আঁকা হলে সবাই বাঁশিটা মুখের কাছে দেয়। বাঁশি বাজাচ্ছে তাই বোঝায়। কিন্তু এখানে বাঁশিটা একটু দূরে ধরা, ছেলেটার মুখ দেখলে মনে হয়, সে এখনও বাঁশি বাজানো শুরু করেনি। বাঁশিটা হাতে নিয়ে কিছু একটা ভাবছে। তার মানে, শিল্পী এখানে ট্র্যাডিশানের চেয়ে একটু আলাদা হতে চেয়েছে। এটা বাঁশি হাতে কেষ্টঠাকুর নয়। আর একটা জিনিস দেখ, গাছ আর ছেলেটা ছবির বাঁ-দিকে, তাই ব্যালান্স করবার জন্য ডান দিকের কোণে কুকুরটাকে বসিয়েছে। এটা যে কেষ্টঠাকুর নয়, সাধারণ রাখালের ছবি, সেটাও বোঝানো হয়েছে ওই কুকুরটাকে দিয়ে। কেষ্টঠাকুরের সঙ্গে কুকুরের অনুষঙ্গ নেই, ময়ুর কিংবা হরিণ-টরিণ কিছু থাকত।

বাবাঃ, তুমি তো অনেক কিছু বলে ফেললে চন্দনদা। আমি এত সব বুঝি না।

ভাল করে দেখলেই বোঝা যায়। মহিমবাবুটা একটা পাঁচ নম্বুরি গাড়ল। এই রকম ছবি দিয়ে কেউ নালিশ করে? ক্যামেরাটা আনলাম না, এর একটা ছবি তুলে রাখা উচিত। কয়েকজনকে দেখাতাম।

কাল সকালে ক্যামেরা নিয়ে এসো।

কী দিয়ে এঁকেছে বল তো? সরু আর মোটা, দুরকম রেখাই আছে। কুকুরটাকে মোটা আউট লাইনে এঁকে গায়ে ছোট ছোট লোমও দিয়েছে। দু'রকম তুলির কাজ?

নানা, চন্দনদা। ও মেয়েটা তুলি-ফুলি কোথায় পাবে? ওর কাছে কিছু থাকে না। টিফিনের সময় কোনও কাঠি দিয়ে আপন খেয়ালে এঁকেছে।

আরও কিছুক্ষণ ধরে ছবিটা দেখার পর টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে চন্দনদা বলল, তাহলে তো খুব মুশকিল হল রে নীলু। যে-মেয়ে এ-রকম ছবি আঁকে, সে এক জন খাঁটি শিল্পী, তাকে দিয়ে আমরা মাথায় ইট বওয়াবার কাজ করাব? এটা তো একটা সামাজিক অন্যায়।

আমি বললাম, বেশি বাড়াবাড়ি কোরোনা চন্দনদা। ছবি তো অনেকেই আঁকে। আমি তো দেখেছি, কলকাতার রাস্তায় অনেক সময় কেউ কেউ ফুটপাথের ওপর রঙিন চক দিয়ে বড় বড় ছবি এঁকে ভিক্ষে করে। তারাও তো শিল্পী।

চন্দনদা জোর দিয়ে বলল, না। সে-সব ছবি আমিও দেখেছি। সেগুলো ডাল। নিষ্প্রাণ। যে-সব ছবিতে একটা অন্তদৃষ্টি থাকে, সেগুলোই আসল ছবি হয়। আমি ছবি চিনি।

যারা বাউল গান করে, কী চমৎকার গলা। তারাও তো গায়ক। কিন্তু তাদের ট্রেনে ভিক্ষে করতে হয়।

তুলনা দিবি না, খবরদার তুলনা দিবিনা। ভেরি ব্যাড লজিক। বাউলদের ঠিকমতো কদর হয় না বলে শিল্পীদেরও অনাদর করতে হবে? তাছাড়া আজকাল ছবির বাজার ভাল। মধুবনী পেইন্টিংসও তো সাধারণ গ্রামের মেয়ের ছবি আঁকে, ভাল দামে বিক্রি হয়। আমি ছবি চিনি, এটা একটা...।

একখানা ছবি দেখেই কি কোনও শিল্পীকে চেনা যায়!

এই এতক্ষণে একটা দামি কথা বলেছিস নীলু। না, শুধু একটা ছবি দেখলে কিছু বলা যায় না। এই ছবিটা কপি হতে পারে। অন্য কারুর ছবি দেখে যদি এঁকে থাকে, তাহলে অবশ্য কিছুই না। কপি করতে দক্ষতা লাগে বটে, সিনেমার বড় বড় হোর্ডিং যারা আঁকে তারাও এক ধরনের আঁকিয়ে, কিন্তু শিল্পী নয়। নিজের মাথা থেকে একা নতুন বিষয়কে নতুন ভাবে আঁকা আলাদা ব্যাপার। কাল সকালে এসে আমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চন্দনদা আবার বলল, ছবিটা দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল রে আমার!

পরদিন নটার সময় এসে আমি চমকে গেলাম। দোতলার দেয়ালের ছবিটা কেউ মুছে ফেলেছে!

মিস্তিরি-মজুররা জমা হচ্ছে এসে এসে। সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কিছু জানে না। ফুলমণি অন্য দিনের মতোই নিস্তব্ধ। কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। এক সময় ধৈর্য হারিয়ে আমি অন্য এক জন সাঁওতালকে জিজ্ঞেস করলাম, এই মেয়েটা কথা বলতে পারে না?

সে বলল, হ্যাঁ গো বাবু, পারে। কিন্তু বলে না।

খানিক বাদে চন্দনদা এসে খুব রাগারাগি করতে লাগল। ক্যামেরা এনেছে সঙ্গে। ফুলমণিকে জেরা করা হল অনেক, সে শুধু মাথা নাড়ে। তবু আমার সন্দেহ হল, ফুলমণিই ছবিটি মুছে ফেলেছে।

চন্দনদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, টিফিনের সময় আমি আবার আসছি।

অন্য দিনের মতোই শুরু হয়ে গেল কাজ। তিন তলার গাঁথনি শুরু হয়েছে, এক তলা থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ইট, বালি, সিমেন্ট। লক্ষ্য করলাম, ইরফান আলি যেন অন্য দিনের চেয়ে ফুলমণিকে বেশি খাটাচ্ছে। ছবিটা আঁকার জন্য ফুলমণি খানিকটা গুরুত্ব পেয়ে গেছে, সেটা ইরফান আলির পছন্দ হয়নি। যেখানে লাভ-লোকসানের প্রশ্ন নেই, সেখানেও মানুষের মনে এক ধরনের ঈর্ষা কাজ করে।

বাঁশের ভারা বেয়ে আমিও উঠে গেলাম দো-তলার ছাদে। সিঁড়ি এখনও তৈরি হয়নি। এক পাশে কাজ চলছে, আর একপাশটা ফাঁকা। এ-রকম ন্যাড়া ছাদের প্রান্তে এসে নিচের দিকে তাকালে ভয় ভয় করে। খানিকটা দূরেই ছোট ছোট টিলা। বনতুলসীর

ঝোপঝাড়টাও দেখা যায় এখান থেকে। ছোট নদীটার ধারে বসে আছে কয়েকটা বক। গোটা চারেক কালো কালো মোষ, এখানে ওদের বলে কাড়া, হেঁটে পার হচ্ছে নদী।

মাঝে মাঝে ফুলমণির দিকে চোখ চলে যাচ্ছে আমার। সে মাথায় করে ইট আনছে ওপরে, আবার নেমে যাচ্ছে, কোনও দিকে তার দৃষ্টি নেই। এত রোগা মেয়ের এক সঙ্গে বারো-চোদ্দটা ইট বয়ে আনছে কী করে? পড়ে না যায়। ইরফান আলি মাঝে মাঝে তাকে অকারণ তাড়া দিয়ে বলছে, ইতনা দের কাঁহে হোতা? জলদি করো, জলদি করো।

টিফিনের সময় হোটেল থেকে খেয়ে এসে আমি দেখলাম, চন্দনদা বসে আছে বারান্দায়। পাশে একটা বড় ব্যাগ।

আমাকে দেখে বলল, খেয়ে এসেছিস? গুড! ওদেরও খাওয়া হয়ে এল। এবার একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।

ব্যাগটা থেকে চন্দনদা বার করল ফুলস্কেপ সাইজের অনেকগুলো কাগজ আর অনেকগুলো পেন্সিল, সেগুলোর এক দিকে লাল অন্য দিকে নীল শীস।

আঠেরো জন মিস্তিরি-মজুদের সবাইকে ডেকে চন্দনদা একখানা করে সেই কাগজ ও পেন্সিল ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, তোমরা সবাই আঁকো যার যা খুশি। যেমন ইচ্ছে আঁকো। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।

বাচ্চাদের যেমন সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতা হয়, সেই রকমছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গেল আঠেরো জন। তিনটি সাঁওতাল মেয়ে শুধু খিলখিলিয়ে হাসে। ফুলমণি সকলের থেকে অনেক দূরে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল।

চন্দনদা বলল, এদের কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়। তাতে ওরা লজ্জা পাবে।

গাড়ি থেকে একটা আইস বক্স আর গেলাস নামিয়ে চন্দনদা চলে এল একটা কোণের ঘরে। আইস বক্স থেকে বেরুল ঠাণ্ডা বিয়ারের বোতল। একটা বোতলের ছিপি খুলে

চন্দনদা বলল, তোকে কিন্তু দিচ্ছি না নীলু। এখানে তুই আমার কর্মচারী। সাব অরডিনেট স্টাফ-এর সঙ্গে কাজের সময় বিয়ার খেলে আমার বদনাম হয়ে যাবে।

একটু পরেই এসে হাজির হলেন মহিমবাবু।

ঠোঁটের এক কোণে হেসে চন্দনদাকে বলল, স্যার, আপনি নাকি কুলি-কামিনদের দিয়ে ছবি আঁকাচ্ছেন?

চন্দনদা বলল, হ্যাঁ। আপনাকে কে খবর দিল?

মহিমবাবু বলল, খবর ঠিক ছড়িয়ে যায়।

চন্দনদা বলল, আপনি এসেছেন, ভাল করেছেন। বসুন, আপনিও দেখে যাবেন ছবিগুলো।

চেয়ার মাত্র একখানা। জানালা-দরজাও এখনও বসানো হয়নি। মহিমবাবুকে আমারই মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

চন্দনদা মহিমবাবুকে জিজ্ঞেস করল, বিয়ার খাবেন? গেলাস অবশ্য একটাই, আপনাকে বোতল থেকে চুমুক দিতে হবে।

মহিমবাবু জিভ কেটে বললেন, আমার ও-সব চলে না। জীবনে কখনও ছুঁইনি।

তারপর আমার দিকে চেয়ে তিনি সমর্থন আশা করলেন।

চন্দনদা বলল, গুড। আপনি বিড়ি-সিগারেট খান না, মদ খান না, কাজে ফাঁকি দেন না, বউয়ের খুব বাধ্য, আপনার তো স্বর্গের টিকিট কাটা হয়েই আছে।

আমি সরে পড়লাম সে-ঘর থেকে। মহিমবাবু দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি শুধু শুধু সে-শাস্তি পেতে চাই কেন।

মিস্তিরি-মজুররা কেউ একতলার বারান্দায়, কেউ দোতলার সিঁড়িতে বসে ছবি আঁকায় নিমগ্ন। কেউ কেউ এখনও হেসে যাচ্ছে।

ওদের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমি নেমে গেলাম মাঠে। এদিকে সেদিকে কয়েকটা গাছ পোঁতা হয়েছে মাত্র, পরে বাগান হবে। আজ থেকে তিন-চার বছর বাদে জমজমাট হয়ে যাবে এই জায়গাটা। কত লোক কাজ করবে, কত নোংরা জমা হবে, মানুষের রেষারেষিতে দূষিত হবে বাতাস। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তুলসীর জঙ্গল। বনতুলসীর প্রতি মায়া করে তো সভ্যতার অগ্রগতি থেমে থাকবেনা।

এখানকার সীমানা-পাঁচিলের ওপারেও কিছু বনতুলসী ফুটে আছে। একটা পাতা ছিঁড়ে গন্ধ নিলাম। এই গন্ধটাই স্মৃতিতে থেকে যাবে।

খানিক বাদে একটা ঘণ্টা বাজার ঝনঝন শব্দ হল। অর্থাৎ টিফিন টাইম শেষ। অন্য দিন ওই ঘণ্টা আমি বাজাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চন্দনদা বলল, এই নীলু, কাগজগুলো নিয়ে যায়।

পরীক্ষার হলের গার্ডের মতো ছাত্রদের কাছ থেকে উত্তরপত্র সংগ্রহ করার মতো আমি ওদের কাছ থেকে ছবিগুলো নিতে লাগলুম। নিতে নিতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। ওরা কি আমাদের সঙ্গে মস্করা করছে নাকি? ফুলমণির কাগজটা নিয়ে আমি কটমট করে তাকালাম তার দিকে। সে মুখ ফিরিয়ে আছে, তার মুখখানা বিষাদ মাখান।

চন্দনদা বলল, দেখি দেখি!

একটার পর একটা সবকাগজ উলটে গিয়ে চন্দনদা হাহাকারের মতো বলে উঠল, এ কী? ওই মেয়েটার কোনটা?

কোনও কাগজেই কোনও ছবি নেই। যা আছে তা কহতব্য নয়।

ইরফান আলি এঁকেছে একটা বাড়ির নকশা। সোজা সোজা দাগে। আর কয়েক জন এঁকেছে কাঠি-কাঠি, হাত-পা-ওয়ালা আর গোল মুণ্ডু যেসব মানুষ গুহাচিত্রে আঁকা হয়, সেই রকম কিছু। কেউ এঁকেছে পদ্মফুল, কেউ এঁকেছে পাঁচ ইঞ্চি আমগাছে দেড় ইঞ্চি সাইজের আম ঝুলছে। সাঁওতালরা কেউ কিছু আঁকেনি। সারা কাগজ ভরে কাটাকুটি করেছে। কেউ-বা পেন্সিলের চাপে কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছে।

প্রত্যেকটা কাগজে আমি নম্বর লিখে দিয়েছিলাম। সুতরাং কে কোন কাগজ পেয়েছিল তা আমার আন্দাজ আছে। ফুলমণির কাগজটা একনম্বর, যে শুধু গোল গোল দাগ দিয়েছে, আর কিছুনা।

সেই কাগজটা চন্দনদা উলটেপালটে অনেক ভাবে দেখল। তারপর হতাশ ভাবে বলল, না কিছু না! এ কী হল রে নীলু?

মহিমবাবু কাগজগুলোকে নিয়ে দ্রুত চোখ বোলালেন। তারপর হ্যা হ্যা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। এরা যে কেউ কোনও ছবি আঁকতে পারেনি, সেটা যেন তারই বিপুল জয়।

চন্দনদা বলল, সবাই ছবি আঁকতে পারে না ঠিকই, কেউ কেউ একটা সোজা দাগও টানতে পারে । কিন্তু এত জনের মধ্যে এক জনও অন্তত... কাল দেয়ালে যে ছবিটা দেখলাম।

মহিমবাবু বললেন, বাজে, সব বাজে।

আমি বললাম, চন্দনদা, আমাদের বোধহয় গোড়াতেই একটা ভুল হয়ে গেছে।

চন্দনদা মুখ তুলে আমার দিকে সরু চোখে তাকাল।

আমি বললাম, আমরা ওদের কাগজ-পেন্সিল দিয়েছি। ওদের মধ্যে অনেকে জীবনে কখনও পেন্সিলই ধরেনি। কলম-পেন্সিল দিয়ে কী করে লিখতে হয়, সেটাও তো শেখা

দরকার। হাতে-খড়ির সময় বাচ্চাদের কলম ধরতে শেখানো হয় না? এদের হাতে-খড়িই হয়নি, এরা আরও শিশু।

চন্দনদা বলল, এটা একটা পয়েন্ট বটে। এরা পেন্সিল ধরতে জানে না।

আমি বললাম, যারা জীবনে কখনও দেশলাই কাঠি জ্বালেনি, তার হাতে তুমি একটা দেশলাই দাও, জ্বালতে পারবে না। অথচ কাজটা খুব সোজা! মেয়েরা কত সহজে সূচ-সুতো দিয়ে সেলাই করে, কিন্তু তুমি আমি চেষ্টা করলে...।

মহিমবাবু বললেন, বাদ দিন, এবার ও-সব কথা বাদ দিন। মি. ঘোষাল, আমাদের চার নম্বর প্লটের ঢালাইটা কি কালই হবে? আকাশে মেঘ জমেছে। আজই তাহলে সব ব্যবস্থা করতে হয়।

চন্দনদা মহিমবাবুর মুখের দিকে খানিকটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আমার মাথায় আর একটা আইডিয়া এসেছে। আজ আর টিফিনের পরে কাজ করতে হবে না। ওদের হাফ ডে ছুটি।

এমনি এমনি ছুটি দিয়ে দেবেন?

এমন এমনি নয়। ওদের দিয়ে আবার ছবি আঁকাব!

মি. ঘোষাল, কোম্পানি ওদের বিনা কাজে মাইনে দেবে?

কোম্পানির ব্যাপারটা আমি দেখব। বিনা কাজ মানে কী, ছবি আঁকাটা একটা কাজ নয়?

আমি অস্বীকার করছিনা। কিন্তু সেটা কি কোম্পানির কাজ?

আলবাত! আমরা এখানে কারখানা বানাব, শহর বসাব, কিন্তু তাতে স্থানীয় লোকদের জীবনযাত্রার কোনও ক্ষতি যাতে না হয়, সেটা দেখাও আমাদের কোম্পানির দায়িত্ব। জীবনযাত্রা মানে শুধু খাওয়া পরা আর চাকরি নয়। কালচারাল অ্যাকটিভিটিও তো আছে।

কেউ যদি ভাল ছবি আঁকে কিংবা গান গায় কিংবা খেলাধুলোয় ভাল হয়, তাদেরও এনকারেজ করতে হবে। এখন কে কেমন ছবি আঁকে দেখছি, পরে গানের ব্যাপারটা দেখতে হবে। তারপর খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা।

আমার দিকে চেয়ে চন্দনদা বলল, সবাইকে ডাক।

মিস্তিরি মজুররা এর মধ্যে আবার কাজে লেগে গেছে।

আমি বুঝতে পারি, আমার চাকরিটাই এখানে অবান্তর। এরা এখানে ফাঁকি দিতেই শেখেনি। কেউ দেরি করে আসেনা, কত দূরের গ্রাম থেকে আসে, তবু ঠিক সময় আসে, ছুটির আগে কেউ পালাবার ছুতো খোঁজে না। মাইনেটা এদের কাছে নিমক, নিমক খেলে তা ঠিক ঠিক শোধ দিতে হবে। আমার কাজটাই বরং ফাঁকির।

কাজ ছেড়ে চলে আসবার জন্য সবাইকে ডাকতে, এরা বেশ অবাক হল।

চন্দনদা হাত তুলে সবাইকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে বক্তৃতার ঢঙে বলতে লাগল, শোনো, অন্য দিন তোমরা যা কাজ করো, আজ তোমাদের তা করতে হবে না। রোজ রোজ এককাজ আর ভাল লাগে? আজ তোমরা সবাই ছবি আঁকো। যে যা পারো আঁকো। চেষ্টা করলে কিছুনা কিছু পারবেই। গামলায় চুন গুলে নাও, তারপর আঙুল দিয়ে কিংবা কাঠি বা বুরুশ দিয়ে যার যেমন খুশি দেয়ালে আঁকো। যার ছবি আমার পছন্দ হবে, তাকে আমি একশো টাকা প্রাইজ দেব।

ইরফান আলি অপ্রসন্ন ভাবে বলল, আজ তিন তলা গাঁথনি আরম্ভ করেছি, এক ধারটা শেষ হয়ে যেত।

চন্দনদা বলল, কাল হবে, কাল হবে। যাও, যাও, সবাই শুরু করো।

মিস্তিরি-মজুররা ছত্রভঙ্গ হবার পর চন্দনদা মহিমবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আঁকতে পারেন?

মহিমবাবুর বিয়ার খাওয়ার প্রস্তাবে যেরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেই রকম ভাবেই প্রায় আঁৎকে উঠে বললেন, ছবি? আমি? না, না, না।

চন্দনদা বলল, তাহলে চলুন, আপনি আর আমি কাজ করতে যাই। চার নম্বর সাইটটা দেখে আসি। এরা আঁকুক। নীলু, তুই চেষ্টা করতে পারিস। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল হবে কেন? তোর ছবি ফার্স্ট হলে তুই পাবি একশো টাকা।

চন্দনদার জিপ সশব্দে বেরিয়ে গেল।

এদিকে চুন গোলা শুরু হয়ে গেছে। ছবি আঁকতে পারুক বা না পারুক, চন্দনদার আদেশটাকেও এরা কাজ বলে ধরে নিয়েছে। হতে পারে এটা সাহেবের খেয়াল, কিন্তু এর জন্য তো মাইনে কাটা যাবেনা।

ফুলমণি সম্পর্কেই আমার বেশি কৌতূহল। ওই বোবা মেয়েটা কালকের ছবিটা কেন মুছে দিল আজ সাত সকালে এসে? অত ভাল ছবি আঁকে, ও কি সত্যিই পেন্সিল ধরতে জানে না? কিংবা ও লজ্জা পেয়ে গেছে?

অন্যদের সঙ্গে ফুলমণিও চুন গুলছে।

আমি কিছুক্ষণ বই নিয়ে বসে রইলম ঘরটার মধ্যে। আধ ঘণ্টা বাদে অন্য দিনের মতোই বেরিয়ে পড়লাম কাজ পরিদর্শনে। ইরফান আলি ও আর দু'জন এক জায়গায় বসে বিড়ি ফুঁকছে। ইরফান আলি হেড মিস্তিরি, চুনের কাজে হাত দিতে বোধহয় তার সম্মানে বাধে।

অন্য অনেকে কিন্তু বিভিন্ন দেয়ালে ছবি আঁকতে শুরু করেছে। কাঠির পাতায় ন্যাকড়া জড়িয়ে তৈরি করেছে বুরুশ। কেউ কেউ আঁকছে শুধু আঙুলে।

ফুলমণি আঁকছে দোতলার একটা দেয়ালে! সে খুব দ্রুত হাত চালাচ্ছে। ওই দেয়ালে যে রোদ পড়েছে, তার রঙটা যেন অন্য রকম। ওঃ হহ, উলটো দিকটা উত্তর, সে-দিকটা খোলা। উত্তরের আলো ছবি আঁকার পক্ষে প্রকৃষ্ট, মেয়েটা তা জানল কী করে?

চুনে আঙুল ডুবিয়ে সে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছে। কী আঁকছে বোঝাই যাচ্ছেনা। মেয়েটার চোখ শুধু আঙুলের ডগায়।

দূর থেকে আমি তার টেকনিকটা লক্ষ্য করলাম। কখনও আঙুল চ্যাপ্টা করে টানছে মোটা মোটা রেখা, কখনও নখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলছে সরু সরু রেখা। তার ডান হাতের একটা নখ বেশ বড়।

ওর মনঃসংযোগের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমি নেমে গেলাম নিচে। অন্য যে তিনটি সাঁওতাল মেয়ে সবসময় হাসাহাসি করে, তারাও এখন আঁকায় ব্যস্ত, একজন তীর-ধনুক হাতে এক বীরপুরুষের রূপ ফুটিয়ে তুলেছে অনেকটা, মন্দ নয় তো ছবিটা।

একা একা একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার মনে হল, চন্দনদাকেই একটা কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। এমনিতে চন্দনদাকে আমার খুব একটা পছন্দ নয়। নানা রকম হুজুগ তুলে প্রায়ই নিজের সংসারে নানা রকম গোলমাল পাকায়। একবার তো নীপাবউদির সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। বাবা-মায়ের ঝগড়ায় তিতিবিরক্ত হয়ে ওদের মেয়ে মুমু আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।

কিন্তু একটা কোম্পানির বড় সাহেব হয়ে, নিজের মিস্তিরি-মজুরদের দিয়ে কাজ করাবার বদলে ছবি আঁকাচ্ছে, এ-রকম কি ভূভারতে আর কোথাও পাওয়া যাবে? চন্দনদার হুজুগগুলোও আলাদা ধরনের।

হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে একটা লরি এসে থামল গেটের সামনে। লরিভর্তি বালি।

অন্যদিন লরিতে সুরকি, বালি, ইট বা সিমেন্ট এলে ইরফান আলিই সবকিছু বুঝে নেয়। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পাশে, মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে। আমাদের লোকেরাই ওসব নামিয়ে নেয় লরি থেকে।

আজ তো সে-প্রশ্নই ওঠেনা।

প্রথম কথা, আমাদের মিস্তিরি মজুররা এখন শিল্পী, তাদের শারীরিক পরিশ্রম করার কথা নয়। শিল্পীর আঙুল এখন বালিতে ডুবতেই পারে না।

দ্বিতীয় কথা, লরিওয়ালা তার লোকেদের যদি মালটা নামিয়ে দিতে চায়, তাতেও শব্দ হবে, শিল্পীদের ব্যাঘাত ঘটবে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা যামিনী রায় ছবি আঁকছেন। আর কাছেই কিছু লোক হুসহাস শব্দ করে লরি থেকে বালি নামাচ্ছে, এ দৃশ্য কি কল্পনা করা যায়? আমাদের এই নবীন শিল্পীরা কেউ যে অবনী ঠাকুর বা যামিনী রায় হচ্ছে না, তা কে বলতে পারে?

লরি ড্রাইভার নেমে দাঁড়িয়েছে, তাকে আমি বললাম, আজ মাল নামানো হচ্ছে না, ওয়াপস যাও, কাল আও!

বিকেলবেলা জায়গাটা এত নিস্তব্ধ দেখে লরিওয়ালা কিছুটা কৌতূহলী হয়েছে, আমার কথা শুনে আরও অবাক হল।

সে জিজ্ঞেস করল, কিউ।

আমি বললাম, মিস্তিরি লোক আভি ছবি আঁকতা হ্যাঁয়। তসবির, তসবির, তসবির বানাতে হ্যায়।

সে বলল, কেয়া?

বিস্ময়ে লোকটির চোয়াল ঝুলে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। লোককে চমকে অবাক করে দেওয়াটা আমার প্রিয় খেয়াল। আমি ওকে আরও গুলিয়ে দেবার জন্য এক হাতের পাঞ্জায় পেন্সিল বুলোবার ভঙ্গি করে বললাম, ছবি, ছবি!

এই সময় ইরফান আলি ছুটতে ছুটতে এল। এক মুঠো বালি নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বলল, কেইসান বালি লায়া? মোটা দানা। ঠিক হ্যায়, ওহি কোনাসে উতারো।

আমি বললাম, আজ বালি উতারোবে না। কাল আনবে।

ইরফান আলি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, আমি জোর করে বললাম, কাল, কাল। এক দিন পরে বালি এলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

ইরফান আলিকে জব্দ করে এবং হতভম্ব লরি ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার বেশ তৃপ্তি হল। প্রতি দিন তো আর এ-রকম ঘটনা ঘটে না।

পাঁচটা বাজার একটু পরে আকাশে ঘনিয়ে এল মেঘ। আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আলো। এরপর আর ছবি আঁকা যাবেনা, ইলেকট্রিসিটিও নেই। ওদের মেয়াদ ছটা পর্যন্ত।

আকাশের অবস্থা দেখেই সাত তাড়াতাড়ি চন্দনদা চলে এল মহিমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, যত দূর হয়েছে তাই-ই দেখা যাক। আর দেরি করা যাবে না।

শুরু হল এক তলার দেয়াল থেকে।

ইরফান আলি কিছুই আঁকেনি। অন্য দু'জন কলের মিস্তিরিও চুন ছোঁয়নি, হয়তো তাদের কোনও রকম সংস্কার আছে।

চন্দনদা ইরফান আলিকে জিজ্ঞেস করল, কী আলিসাহেব, আপনি কিছু আঁকলেন না?

ইরফান আলি চাপা বিদ্রুপের সুরে বলল, আমার একশো টাকার ইনাম দরকার নেই বড়বাবু। ওরা কেউ নিক।

আমি চন্দনদার হাতে মৃদু চাপ দিলাম। যারা কিছু আঁকেনি, তাদের কোনও চাপ না দেওয়াই ভাল।

এক তলার দেওয়ালগুলো দেখতে দেখতে এগোলাম আমরা। অন্যদের তুলনায় সাঁওতালদের আঁকাই চোখে পড়ার মতো। তারা প্রত্যেকেই কিছু না-কিছু এঁকেছে। সাঁওতালদের গ্রামে গিয়েও দেখেছি, তারা বাড়ির সামনে আল্পনা দেয়, মাটির দেয়ালে অনেক কিছু এঁকে রাখে। বাসন্তী নামে একটি মেয়ে, যে সবসময় ফিকফিকিয়ে হাসে আর উঁচু স্কেলে কথা বলে, সে এঁকেছে একটা সম্মিলিত নাচের দৃশ্য। সাত-আটটি নারী-পুরুষ কোমর ধরাধরি করে আছে।

চন্দনদা সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাঃ।

বাসন্তী হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল, কেমন গো বাবু?

চন্দনদা আবার বলল, বাঃ।

আমি চন্দনদাকে ওপরে যাবার জন্য তাড়া দিতে লাগলাম।

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। সবাই শিল্পী হয় না, এক জন দুজনই হয়। কোনও সন্দেহ নেই ফুলমণিই এখানে একমাত্র শিল্পী। অন্যরা দর্শনীয় কিছু কিছু এঁকেছে বটে কিন্তু খাঁটি অর্থে ছবি বলতে যা বোঝায়, তা এই একখানাই।

ফুলমণি তখনও ছবিটা শেষ করছিল, আমাদের দেখে এক পাশে সরে গেল।

বড় দেয়াল জুড়ে ফুলমণি এঁকেছে একটা ল্যান্ডস্কেপ। পাহাড়ের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট নদী, সেই নদী দিয়ে পার হচ্ছে কয়েকটা মোষ, একা মোষের পিঠে বসে আছে রাখাল, তার মাথার ওপরে উড়ছে কয়েকটা বক। শুধুচুন নয়, খানিকটা কাঠকয়লাও

ব্যবহার করা হয়েছে। চুনের ফ্যাটফেটে সাদা ভাবটার মধ্যে খানিকটা কালো মিশিয়ে গভীরতা আনা হয়েছে অনেকখানি।

চন্দনদা অভিভূত ভাবে একবার ছবিটার দিকে, আর একবার ফুলমণির দিকে তাকাতে লাগল। সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না যে, যে-মেয়েটা সারা দিন মাথায় ইট বয়ে জীবিকা অর্জন করে, সে কী করে এমন ছবি আঁকে। লেখাপড়া জানে না, দুনিয়াটা চেনেনা। ছবির ইতিহাস সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, অথচ আধুনিক ছবির ধারার সঙ্গে এ ছবির রীতিমতো মিল আছে। কোনও রকম শিক্ষা ছাড়া এ-রকম ছবি আঁকা যায়?

চন্দনদা ফুলমণির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ও মেঝেন, তোমাকে ছবি আঁকা কে শেখাল? তুমি অন্য কোনও ছবি দেখে এটা এঁকেছ?

ফুলমণি কোনও উত্তর দিল না।

আমি বললাম, চন্দনদা, ছাদ থেকে এই নদীটা দেখা যায়। আজ সকালেই আমি দেখেছি।

আমাকে মাথায় করে ইট বইতে হয় না, দেয়ালে গাঁথতে হয় না, আমি ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দূরের দৃশ্যটা উপভোগ করেছিলাম। ফুলমণি সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। তার মধ্যেই সে এই দৃশ্যটা দেখল কখন? শুধু দেখেনি, মনে গেঁথে নিয়েছে।

অন্যরা ভিড় করে এই ছবি দেখতে এসেছে। অনেকেই ছবি আঁকতে পারে না, ছবি দেখার চোখও থাকে না। ছবি দেখার অভ্যেস যাদের নেই, তারা রিয়েলিস্টিক ছবি দেখেও বিষয়বস্তু চিনতে পারে না।

আমি ছাদের দৃশ্যটা উল্লেখ করায় ওদের এক জন বলল, হ হ, লদী বটে!

অন্য এক জন বলল, কালা কালা উগুলান কী, খাসি লয়?

বাসন্তী, যে কিছুটা আঁকতে পারে, সে বলল, কানা নাকি তুই, খাসী কুথায়, ওগুলান কাঁড়া, বড় বড় শিং...।

চন্দনদা বলল, এই মোষগুলো দেখ, লাইনের কী জোর! একটাও স্ট্যাটিক নয়। প্রত্যেকটার ঘাড় ঘোরানো, পা তোলা আলাদা। কেউ কম জলে, কেউ বেশি জলে। যারা সাধারণ ছবি আঁকে, তারা মোষ আঁকতে গেলে আখাম্বা একটা মোষ এঁকে দেয়। এ ছবি অসাধারণ।

আমি বললাম, পাখিগুলো দেখো। সামান্য একটা করে প্যাঁচ দিয়েছে, কিন্তু ঠিক বোঝা যায়, ওগুলো কাক কিংবা চিল নয়, উড়ন্ত বক।

চন্দনদা আঙুল তুলে বলল, আমার সব চেয়ে ভাল লাগছে এই মোষটা।

এবার আমারও অবাক হবার পালা। চারটে মোষ ঠিক চেনা যাচ্ছে। কিন্তু চন্দনদা যেখানে আঙুল দেখাচ্ছে, সেখানে মোষ কোথায়? প্রথম মনে হয়েছিল, ছবির মধ্যে এমনি একটা ধ্যাবড়া পড়ে গেছে। ভাল করে দেখে মনে হল, জলে একটা কিছু ভেসে যাচ্ছে।

আমি বললাম, মোষ কই? ওটা, ওটা যেন জলে ভাসছে একটা তিনকোণা কিছু, অনেকটা যেন মনে হচ্ছে সাইকেলের সিট।

চন্দনদা বিরাট জোরে হা-হা করে হেসে উঠল।

তারপর বলল, তুই যে পিকাসোর ঠিক উলটো বললি! পিকাসোর সেই বিখ্যাত গল্পটা জানিস?

কোনটা?

পিকাসোর বাড়িতে একবার চোর এসেছিল। খুটখাট শব্দে পিকাসোর ঘুম ভেঙে যায়। পিকাসো কে কে বলে চেঁচাতেই চোরটা বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে পালাল। পিকাসো দৌড়ে

বারান্দায় এসে এক ঝলক শুধু দেখতে পেলেন গলি দিয়ে সাইকেল চেপে চোরটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। পরদিন সকালে পুলিশ এসে সব খোঁজ খবর নিতে নিতে পিকাসোকে জিজ্ঞেস করল, আপনি চোরটাকে কেমন দেখেছিলেন, একটু বর্ণনা করতে পারবেন? পিকাসো মুখে কিছু না বলে ছবি এঁকে দিলেন। কী আঁকলেন জানিস? একটা মোষের মাথা।

মহিমবাবু এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি, এবার বললেন, অ্যাঁ?

চন্দনদা বলল, পিকাসো যা দেখেছিলেন, হুবহু তাই এঁকেছিলেন। একরকম সাইকেল হয়, দুদিকের হ্যান্ডেল উঁচু হয়ে থাকে। রেসিং সাইকেল যাকে বলে। সেই সাইকেলে বসে মাথা নিচু করে কেউ যদি খুব জোরে চালায়, দূর থেকে একটা শিংওয়ালা মোষের মাথাই মনে হবে। এখানে এই ছবিতে, মোষটা সারা শরীর ডুবিয়ে আছে জলে, শুধু মাথার ওপরটা দেখা যাচ্ছে। তাই তোর মনে হচ্ছে সাইকেলের সিট।

মহিমবাবু বললেন, পিকাসো, খুব বড় শিল্পী, না? নাম শুনেছি। দু'একখানা ছবিও দেখেছি। কিছু বোঝা যায় না মাথামুণ্ডু। না বোঝা গেলে সেটা কি করে ভাল ছবি হয় মশাই?

চন্দনদা মহিমবাবুর কাঁধে চাপড় মেরে বলল, মশাই, এ বিষয়েও পিকাসোর নিজেরই গল্প আছে। প্যারিসে একটা পার্টিতে একটি খুব সাজগোজ করা মহিলা এসে পিকাসোকে ধরেছিল। নাকি সুরে অনুযোগ করে বলেছিল, মি. পিকাসো, আপনার ছবি দেখে কিছুই বুঝতে পারি না। উলটো না সোজা, তা পর্যন্ত বোঝা যায় না। এ-রকম ছবি আঁকার কি কোনও মানে আছে? পিকাসো উত্তর দিলেন, ম্যাডাম, আপনি কখনও চিনে ভাষা শুনেছেন? তার একটি বর্ণও বোঝেন? তার মানে কি আপনার ধারণা, চিনে ভাষার কোনও মানে নেই? সমস্ত চাইনিজরা মিনিংলেস ভাষায় কথা বলে? শিখলেই চিনে ভাষার ঐশ্বর্য বোঝা যায়। ছবি দেখাও শিখতে হয়। না শিখে কথা বলতে আসে মূর্খরা।

চন্দনদা এবার আমার দিকে ফিরে বলল, নীলু, গাড়ি থেকে আমার ক্যামেরাটা নিয়ে আয়। এটা আবার কেউ মুছে ফেলার আগেই একটা ছবি তুলে রাখব। আর হ্যাঁ, আমি একশো টাকা পুরস্কার দেব বলেছিলাম। এই ছবি তার অনেক বেশি পাওয়ার যোগ্য। আমি দুশো টাকা দিচ্ছি।

পকেট থেকে পার্স বার করে চন্দনদা বলল, কোথায় ফুলমণি?

ভিড় ফাঁক হয়ে গেল, সবাই এ-দিক ওদিক তাকাচ্ছে। ফুলমণি নেই। কয়েক জন ডাকাডাকি করতে লাগল ওর নাম ধরে। চন্দনদা পিকাসোর লম্বা গল্প ফাঁদার সময় ফুলমণি সরে পড়েছে।

আমি বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, দূরে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে ফুলমণি। শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় তাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন, কীসের মতো? কীসের মতো? কীসের মতো? নাঃ, আমার তো শিল্পীর চোখ নেই, কোনও উপমাও আমার মনে এল না।

.

০৪.

পরদিন কাজে এল না ফুলমণি।

চন্দনদার দুশো টাকা বাসন্তীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে সাঁওতালদের অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বাসন্তী টাকাটা দিয়ে দিয়েছে, ফুলমণি নিতেও আপত্তি করেনি জানা গেল। চন্দনদার হাত থেকে নিতে ও লজ্জা পেয়েছিল। ওর এত লজ্জা আমি কখনও দেখিনি।

এরা পয়সা জমাতে জানে না। হাতে পয়সা থাকলে কাজ করতেও চায় না। ফুলমণির রোজ ছিল বাইশটাকা, একসঙ্গে দুশো টাকা পেয়েছে, এখন কত দিন কাজে আসবেনা কে জানে! পর পর তিন দিন পাত্তা পাওয়া গেল না তার।

চন্দনদাই ছটফট করছে বেশি।

চন্দনদা অন্য রকম একটা প্ল্যান করে রেখেছিল। এখানে অনেক ট্রেসিং পেপার লাগে, সেগুলো পাঠানো হয় শক্ত কাগজে মোড়া প্যাকেটে। সেই শক্ত কাগজগুলো কেটে কেটে ঠিকমতো সাইজের করা হল। দু'তিন রকম রঙও জোগাড় করেছে চন্দনদা। সেগুলো আমাকে দিয়ে বলেছিল, তুই ফুলমণিকে এই কাগজের ওপর রঙ দিয়ে ছবি আঁকতে বলবি। আঙুল দিয়ে হোক বা যে-ভাবেই আঁকুক। দেয়ালে চুন দিয়ে আঁকা ছবি কিংবা তার ফটোগ্রাফেরও বিশেষ কোনও মূল্য নেই। কাগজের ওপর আঁকা কয়েকখানা ছবি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নাম করা দু'এক জন শিল্পীকে দেখানো যেতে পারে। তাদের মতামত শুনে বোঝা যাবে, সত্যিই মেয়েটার ছবি আঁকার ক্ষমতা কতখানি।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় ফুলমণি? সে নিজে থেকে না এলে তো তাকে জোর করে ধরে আনা যায় না।

আমার ঘরে এসে সন্ধেবেলা চন্দনদা খাটে শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা আজও আসেনি?

আমি বললাম, নাঃ! ওর গ্রামের অন্য মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলতে পারে না। আদিবাসীরা কোনও প্রশ্নেরই সরাসরি উত্তর দেয় না। হয় হাসে, অথবা ঘুরিয়ে অন্য কথা বলে। আমি বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি কেন আসছে না। তার উত্তরে ও প্রথমে খিল খিল করে হাসল। তারপর বলল, আমি যদি এক রোজ না আসি, তুই আমার কথা জিগাস কি ছোটবাবু? বোলো? এরপর কি ফুলমণি সম্পর্কে আর কৌতূহল দেখানো যায়?

চন্দনদা বলল, দেখ নীলু, আমি ছবি আঁকা কনটিনিউ করিনি বটে, কিন্তু ছবি আমি মোটামুটি বুঝি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও মেয়েটা একটা জিনিয়াস। আজকাল ছবির বাজার দারুণ ভাল। একটু নামকরা শিল্পীদের ছবি পনেরো, কুড়ি, তিরিশ, পঞ্চাশ হাজার টাকা দামে বিক্রি হয়। হুসেনের এক-একখানা ছবির দাম লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কিছুদিন আগে একটা গ্যালারিতে এক জন প্রায় নতুন শিল্পীর একজিবিশান দেখতে গেলাম। এক-একটা ওয়াটার কালার ছবির দাম ধরেছে পাঁচ হাজার টাকা। আমার ধারণা, এই মেয়েটাও ছবি এঁকে যথেষ্ট রোজগার করতে পারে। একটা গ্রামের অশিক্ষিত গরিব মেয়ে বলে সুযোগ পাবেনা, তার গুণের কদর হবে না, কেন?

একটা কথা জিজ্ঞেস করি, চন্দনদা। এইটাই আমার কাছে ধাঁধার মতো লাগে। সাধারণ গরিব মানুষ, যাদের খাওয়া-পরার চিন্তাতেই সারা দিন কেটে যায়, তাদের প্রায় কেউই ছবি-টবির ব্যাপার জানেই না, তবু হঠাৎ দু'একজন ছবি আঁকতে চায় কেন?

তুই আদিম গুহামানবদের আঁকা ছবি দেখিসনি? তারা কি ছবির বিষয় কিছু জানত? তাদেরও শুধু খাবার জোগাড়ের চিন্তায় দিন কাটত। তখন স্ট্রাগল ফর একজিসটেন্স ছিল সাঙ্ঘাতিক। তবু তো তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছবি এঁকেছে।

অনেকে যে বলে, খুব বৃষ্টির মধ্যে যখন ওরা গুহা থেকে বেরুতে পারত না, তখনই ওরা সময় কাটাবার জন্য দেয়ালের গায়ে ছবি এঁকেছে।

সময় কাটাবার জন্য অধিকাংশ মানুষই পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কিংবা অন্যের সঙ্গে খুনসুটি করে কিংবা সেক্স-এর তালে থাকে। মাত্র দু'এক জনেই ছবি আঁকে। এটাই একটা রহস্য। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে হঠাৎ দু' এক জন গানের গলা পায়। দু'এক জন কিছু না শিখেও ছবি আঁকতে পারে, দু'এক জন কবি হয়। শিল্পের লাইনে উন্নতি করতে গেলে সবাইকেই শেষ পর্যন্ত শিখতে হয়, সাধনা করতে হয়। কিন্তু ভেতরে কিছু জিনিস না থাকলে তো হাজার ট্রেইনিঙে শিল্পী হওয়া যায় না। এক-এক জনের আবার এই ভেতরের জিনিসটা থাকলেও সুযোগের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে এখন শহরের লোকেরা যত সুযোগ পায়, গ্রামের লোকেরা তার কিছুই পায় না।

শহরের লোকেরা..ইদানীং সব বড়লোকের ছেলে-মেয়েরাই ছবি আঁকা শিখতে যায়, যেখানে সেখানে গানের স্কুল আর কবি, কবিদের তো স্কুলও লাগেনা, হাজার হাজার কবি, সবাই ভাবে কবিতা লেখাটা খুব সহজ। রিটায়ার্ড জজ, ডকের মজুর, যাবতীয় স্কুলমাস্টার, যাবতীয় প্রেমিক দু'চারলাইন লিখেই ভাবে, এই তো কবিতা হয়ে গেল। আজকাল তো আবার ছন্দ মিলেরও ব্যাপার নেই। তুইও কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিস নাকি কখনও নীলু?

রক্ষে করো! দেখছ না আমার হাতের আঙুল, এই আঙুলে কখনও কবিতা বেরুতে পারে? আমি ভুলেও কখনও সে-চেষ্টা করিনি!

চন্দনদা উঠে বসে খানিকক্ষণ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই রকম মুখের ভাব দেখলেই বুঝতে পারি, চন্দনদার মাথায় আবার নতুন কোন প্ল্যান ঘুরছে।

চন্দনদা গাঢ় গলায় বলল, দেখনীলু, ওই ফুলমণি মেয়েটার সত্যিকারের প্রতিভা আছে। সেটাকে নষ্ট হতে দেওয়াটা বিরাট অন্যায়। আমাদের কিছু দায়িত্ব নেই? তাহলে আমরা কীসের মানুষ?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু মেয়েটা যদি নিজে না চায়।

ওকে বোঝাতে হবে! ওকে দিয়ে আরও আঁকাতে হবে। আমি ওকে গোল্লায় যেতে দিতে কিছুতেই রাজি নই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মুশকিল এই, আমি নিজে কিছু করতে পারব না ওর জন্য। আমি কোনও দায়িত্ব নিতে পারব না।

কেন?

তার কারণ, ও একটা মেয়ে।

তাতে কী হয়েছে?

আরে মেয়ে বলেই তো ঝামেলা। ওর কোনও উপকার করতে গেলেই তোর বউদি খেপে যাবে। সেবারে রোহিণীকে নিয়ে কী কাণ্ড হল মনে নেই? নীপার ধারণা, কোনও মেয়েকে আমি যদি কিছু সাহায্য করতে যাই, তার মানেই আমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছি।

যাঃ, কী বলছ চন্দনদা! ফুলমণি সম্পর্কে এ প্রশ্নই ওঠেনা। একটা রোগা হাড় জিরজিরে মেয়ে, সাত চড়ে রা কাড়ে না, কোনও কথাই বলে না, তার সঙ্গে আবার প্রেম হতে পারে নাকি।

তুই বুঝবিনা, মেয়েদের যে কীসে কখন ঈর্ষা হয়। তুই আর মেয়েদের সম্পর্কে কতটুকু জানিস। ওই ফুলমণিটা যদি একটা ছেলে হত, আমি নিজের টাকা খরচ করে ওকে কোনও আর্টিস্টের কাছে কিছুদিন রেখে দিতাম, ওর ছবির প্রদর্শনী নিয়ে সারা ভারতে ঘুরতাম! কিন্তু ওর বেলায় তা পারব না, তোকেই ভার নিতে হবে। তোকে তো আর কেউ প্রেমে পড়ার বদনাম দেবে না, আর বদনাম দিলেই বা তোর কী আসে যায়?

এই সময় হরিলাল হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে এসে খবর দিল, কলকাতা থেকে একটা গাড়ি এসেছে, গাড়ি ভর্তি লোক, তারা চন্দনদাকে খুঁজছে।

আমরা ওপর থেকেই উঁকি মেরে দেখলাম, লালুদার লাল রঙের মারুতি গাড়ি। ভেতরে নীপাবউদি, মুমু আর ওদের বাড়ির রান্নার লোকটি।

লালুদার ওইটুকু গাড়ি থেকে এত জিনিস বেরুতে লাগল যে, মনে হল যেন ম্যাজিক। দুতিন হাঁড়ি মিষ্টি, অনেক রকমের ফল, বাক্স বাক্স চিজ, বিস্কিট, মাখনের টিন, সার্ডিন মাছের টিন, পাঁউরুটি, জ্যাম, জেলি, আচার...।

এসেই লালুদা ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিল।

দারুণ ভাবে শুরু হল রান্নাবান্নার তোড়জোড়। রাত আটটা বেজে গেছে, এ সময় এখনও কোনও দোকান খোলা থাকে না, গ্রামে লোক পাঠিয়ে আনা হল মুরগি। লালুদা নিজে মদ খায় না, সিগারেট খায় না। অথচ সঙ্গে এনেছে হুইস্কি-ব্র্যান্ডির বোতল, দামি দামি সিগারেটের প্যাকেট। চন্দনদার বাংলোয় আড্ডা চলল রাত পৌনে তিনটে পর্যন্ত।

পরদিন সকাল থেকেই আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। লালুদা যেখানে থাকে, সেখানে অন্যদের কথাও বলতে দেয় না, পয়সাও খরচ করতে দেয় না। গ্যাস বিক্রির টাকা যেন অফুরন্ত।

আমাকে নটার সময় ঠিক কাজে যেতে হয়। লালুদা সেখানেও উপস্থিত। বাড়ির কনস্ট্রাকশান বিষয়ে আমাকে কত না উপদেশ দিল তার ঠিক নেই। ওটা যে আমার কাজ নয়, তা বলারও সুযোগ পেলাম না। লালুদাকে মহিমবাবুর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারলে হত। মহিমবাবু এ-দিকে আসেননি।

পাঁচ দিন হয়ে গেল, ফুলমণিরও দেখা নেই।

সন্ধেবেলা চন্দনদা আমাকে চুপি চুপি খানিকটা ভর্ৎসনা করে বলল, নীলু তুই মেয়েটার একটা খবর নিলি না? যদি অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকে? ওই তো রোগা চেহারা, যদি মরে যায়। কাল রবিবার, কাল তুই ওদের গ্রামে যেতে পারিস না?

আমি চুপ করে রইলাম।

ওই রকম একটা ইচ্ছে আমারও হয়েছিল, কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছি না। আদিবাসীদের গ্রামে এখন আর চট করে যাওয়া যায় না, ওরা সন্দেহ করে। অবস্থা অনেক বদলে গেছে। অরণ্যের দিনরাত্রি ফাত্রি এখন আর চলে না। আমার মতো একটা ছোকরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে একটা মেয়ের খোঁজ করলে ওর স্বামীটাই হয়তো আমাকে ধরে পেঁদিয়ে দেবে। আর যদি তীর-ধনুক দিয়ে...।

মাথায় অন্য একটা মতলব এসে গেল।

রাত্তিরে খাওয়ার টেবিলে যখন গল্প বেশ জমে উঠেছে, তখন আমি ফস করে বলে উঠলাম, মুমু কাল সকালে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি? একটা মস্ত বনতুলসীর ঝোপ আছে, সেটা পেরিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ের পাশে ঝরনা।

মুমু বলল, হ্যাঁ যাব, হ্যাঁ যাব।

লালুদা অমনি বলল, কোথায় যাবে নীলমণি? আমি গাড়ি করে নিয়ে যাব। সবাই মিলে যাব।

আমি বললাম, না, গাড়িতে গেলে হবে না। সবাই মিলে গেলেও হবে না। একবার শুধু মুমু আর আমি এই ছোটপাহাড়ীতে এসেছিলাম। তখন যেসব জায়গায় ঘুরেছি এখন আমরা দুজনে সেই সবজায়গা আর একবার দেখব।

লালুদ বলল, ও, সেই যেবার তুমি মুমুকে নিয়ে ইলোপ করেছিলে নীলকণ্ঠ?

নীপা বউদি হেসে ফেলল।

আমি বললাম, দু'বছর আগে মুমু আরও ছোট ছিল। ওর বয়েস তখন এগারো। এগারো বছরের মেয়েকে নিয়ে কেউ কখনও ইলোপ করে?

মুমুটা অতি দুষ্টু। মিচকি হেসে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই তো। এই নীলুকাকা, তুমি সেবার কী সব মিথ্যে কথা বলে আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলে তো!

লালুদা বলল, তারপর তুমি মুমুকে অযোধ্যা পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলে। নীলকমল, আমার সব মনে আছে।

চন্দনদা আমার দিকে তাকিয়ে সমর্থনের হাসি দিল।

মুমু আমার পাসপোর্ট। মুমুর মতো একটি কিশোরী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কোনও আদিবাসীদের গ্রামে গেলে কেউ ভাববেনা, আমি কোনও কুমতলবে এসেছি। ফুলমণির গ্রামের কয়েক জন আমাকে চেনে, ওরা আমার কাছে কাজ করে, ওদের মোটেই উগ্র-হিংস্র বলে মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই। মুমুর মুখখানায় সদ্য কৈশোরের লাবণ্য মাখা, ওকে দেখলেই পছন্দ করে সবাই।

পরদিন ভোরবেলা, লালুদা জাগবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম আমি আর মুমু।

রাত্তিরে বেশ জোর কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে! ভোরের বাতাস রীতিমতো শিরশিরে। বৃষ্টির জলে এখানে কাদা হয় না, মাটিতে সোঁদা সোঁদা ভাব। গাছপালাগুলো সব যেন স্নান করে ফিটফাট সেজে আছে।

মুমু বলল, আগের বার তো আমরা পাহাড়ের দিকে যাইনি!

আমি বললাম, তুই তো চন্দনদার ওপর রাগ করে, অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়লি এক সময়। তারপর তো সন্ধেবেলায় আমরা ফিরে গেলাম কলকাতায়। দুপুরটাতে আমি একা একা এদিকে ঘুরে গেছি। একটা খুব সুন্দর ছোট্ট নদী আছে।

মুমু বলল, অ্যাই ব্লু, আমার যখন আঠেরো বছর বয়স হবে, তখন তুমি আমাকে নিয়ে সত্যি ইলোপ করবে? বেশ মজা হবে তাহলে!

আমি বললাম, তুই যা সুন্দর হচ্ছিস দিন দিন, আঠেরো বছরে তোর এত বন্ধু জুটে যাবে যে তখন আমাকে প্রায় পাত্তাই দিবিনা!

আঠেরো বছর বয়স হয়ে গেলে বুঝি অনেক বন্ধু হয়?

হ্যাঁ, তখনই তো জীবনের শুরু।

ইস, কবে যে আঠেরো বছর আসবে।

আর পাঁচ বছর বাদেই।

এই শোনো, আঠেরো বছর বয়েসে যখন আমার অনেক বন্ধু হয়ে যাবে, তখন আমি যদি তোমাকে পাত্তা না দিই, তুমি কিন্তু তখনও আসবে আমার কাছে। তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।

আহা-হা-হা, তুই অন্য বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবি, তবু আমি তোর কাছে আসব কেন রে?

হ্যাঁ, তোমাকে আসতেই হবে। আসতেই হবে। বলো আসবে?

সে আমি এখন কিছু বলতে পারছি না।

না, তুমি আসবে। প্রমিস করো। এক্ষুনি প্রমিস করো না হলে আমি যাব না।

মুমু একটা সোনাঝুরি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। হালকা সোনালি রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে এসেছে আজ, রঙটার সঙ্গে ভোরের রোদ্দুরের মিল আছে। মাথার চুল উড়ছে একটু একটু। চোখের কোণে এখনও যেন ঘুম লেগে আছে একটু একটু। ছেলেমানুষিতে ভরা মুখখানাতে রাগরাগ ভাব।

মেয়েটা সত্যিই খুব রূপসী হবে। এর মধ্যেই লম্বা হয়েছে অনেকটা।

কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, পাগলী একটা! পাঁচ বছর আগেকার প্রতিজ্ঞার কি কোনও দাম আছে? পাঁচ বছরে কত কী বদলে যেতে পারে। পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আমি ঠিক এক বছরের ফিলোজফি নিয়ে বেঁচে থাকি।

মুমু আমার হাত ছাড়িয়ে সরে গিয়ে বলল, এক বছরের ফিলোজফি? মানে কী আগে বলো!

আমি বললাম, সেই গল্পটা জানিস না। এক জন বিদেশিকে এক রাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিল।

মৃত্যুদণ্ড...মানে ডেথ সেনটেন্স?

হ্যাঁ। মৃত্যুদণ্ড মানে ডেথ সেনটেন্স। আজকাল অনেক বাংলা কথার ইংরিজিতে মানে বলে দিতে হয়। ...রাজা মৃত্যুদণ্ড দেবার পর সেই বিদেশি বলল, মহারাজ, আমাকে যদি বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে আপনার সব চেয়ে যে প্রিয় ঘোড়াটা, সেটাকে আমি আকাশ দিয়ে ওড়া শিখিয়ে দিতে পারি, আপনি সেটায় চেপে আকাশে ঘুরবেন। মহারাজ শুনে হকচকিয়ে গিয়েও বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে আমি এক বছর সময় দিলাম। লোকটাকে জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার পর অন্য এক জন কয়েদি বলল, তুমি কি পাগল নাকি? ওই কথা বললে! ঘোড়া কখনও আকাশে উড়তে পারে? বিদেশিটি বলল, শোনো, এই এক বছরের মধ্যে রাজা মরে যেতে পারেন, ঘোড়াটা মরে যেতে পারে, কিংবা এমন কিছু আবিষ্কার হতে পারে যাতে সত্যি সত্যি ঘোড়াকে আকাশে ওড়ানো যায়। এই সব কথা ভেবে ভেবে আরও অন্তত একটা বছর তো বেশ মজায় কাটানো যাবে!

মুমু খিল খিল করে হেসে বলল, আমি এর নাম দিলাম, নীললোহিত ফিলজফি।

এই রাগ, এই হাসি, এর নাম কৈশোর!

বনতুলসীর জঙ্গলটা পার হয়ে আমরা পৌঁছলাম নদীটার ধারে। এখন মোষেরা পার হচ্ছে না, বকেরাও নেই, তবু নদীটি ফুলমণির আঁকা ছবি হয়ে আছে।

আমি বললাম, তুই সাঁতার শিখেছিস, এখন তো জলে ভয় পাস না!

মুমু ঠোঁট উলটে বলল, মোটে একটুখানি জল, এর মধ্যে সাঁতার কাটা যাবে নাকি?

হেঁটেই পার হতে হবে, তবে এক-এক জায়গায় গভীর আছে। মোষ ডুবে যায়। কিন্তু তোর সালোয়ার-কামিজ যে ভিজে যাবে।

তুমি আগে বললে না কেন? এর তলায় সুইমিং সুট পরে আসতাম।

এক কাজ করা যেতে পারে। আমি হব সিন্দবাদ নাবিক আর তুই হবি বুড়ো, শক্ত করে আমার গলাটা ধরে থাকবি, আমি তোকে পিঠে নিয়ে পার করে দেব।

আমার বুড়ো হতে বয়ে গেছে। ভিজুক গে সালোয়ার!

যে-কোনও নদী পার হতে গেলেই আমার দিকশূন্যপুরের কথা মনে পড়ে। সেখানকার নদী অবশ্য বেশ বড়, খানিকটা সাঁতার দিতেই হয়। সেখানকার বালি সোনার দানার মতো। এ নদীতে বালি নেই, শুধুপাথর।

অল্প জল হলেও স্রোতের টান আছে বেশ।

ছুটির দিনে আমি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আছি। পাজামা উরু পর্যন্ত গুটিয়ে নিতেও অসুবিধে নেই। চটিগুলো আস্তে ছুঁড়ে দিলাম অন্য পাড়ে। জল বেশ ঠাণ্ডা। মুমু আমার হাত ধরে এগোতে লাগল।

এই সকালবেলা মুমুর হাত ধরে একসঙ্গে নদী পার হবার মধ্যে যে ভাল লাগা, তা শুধু আজকের জন্য নয়, এক বছরের জন্যও নয়, তা চিরকালের।

মাঝখানটায় বেশ জল, মুমুর কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল, আমি ওকে জোর করে তুলে নিলাম বুকে। মুমু হাত-পা ছুঁড়ে আপত্তি জানাতে লাগল, আমি প্রায় দৌড়ে চলে এলাম এ পাড়ে।

পোশাকের ওপরের অংশটা না ভিজলেই হল। তলার দিকটা ভিজলে তেমন ক্ষতি নেই, গায়ে ঠাণ্ডা বসে না।

এতক্ষণ একটাও মানুষজন দেখিনি, এবার দেখা গেল দুটো বাচ্চা ছেলেকে। ওরা কী একটা দুর্বোধ্য গান গাইছে। এক লাইন এক জন, আর এক লাইন অন্য জন।

ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এই, পিঁজরাল গাঁওটা কোন দিকে রে?

উত্তর না দিয়ে ছেলে দু'টি পাহাড়ের তলা দিয়ে এক দিকে ছুটে গেল অনেকখানি। একটা বড় শিমুল গাছের তলায় থেমে হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকল। কাছে যেতে এক জন বলল, এই নিচা দিয়ে চলে যাও। হঁই দেখো পিঁজরাল গাঁও।

ওরা আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকেই নির্দেশনা দিয়ে যে এই পর্যন্ত ছুটে এল, সেটাই এ-দিককার মানুষের বিশেষত্ব। যদি বলতাম, আমাদের এই গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চল তো, তা-ও যেত অম্লানবদনে। আমি ছেলে দুটোর মাথার চুলে হাত ডুবিয়ে আদর করে দিলাম।

মুমু জিজ্ঞেস করল, আমরা পাহাড়টার ওপরে উঠব না?

আগে চল পিঁজরাল গ্রামটা ঘুরে আসি।

সেখানে কী আছে?

সেখানে একটা মেয়ে আছে, ছবি আঁকে, তোর চেয়ে অনেক বড়, বোধহয় আমার বয়সী, তার সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে।

ও, তুমি একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। সেকথা আগে বলোনি!

চন্দনদা ঠিকই বলেছিল, মেয়েদের যে কখন, কেন ঈর্ষা জেগে ওঠে, তা বোঝা দুঃসাধ্য।

মুমু মুখ গোঁজ করে বলল, আমি এখন এই পাহাড়টার টপে উঠব!

আমি হেসে বললাম, তাহলে তোকে একা উঠতে হবে ভাই। আমি আগে গ্রামটায় যাব।

তুমি পাহাড়ে যাবে না আমার সঙ্গে?

তুই আমার সঙ্গে গ্রামে যাবি না! কে কার সঙ্গে কখন কোথায় যাবে সেটা আগে ঠিক করা যাক।

ক্লু; তুমি একটা অতি পাজি, মিথ্যেবাদী, গুড ফর নাথিং, বেবুন, ব্লিস্টারিং বার্নাকল, থান্ডারিং টাইফুনস।

এই, আমাকে গালাগালি দিবিনা বলছি মুমু। এখানে কেউ নেই, মেরে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব।

ইস, মারো তো দেখি! দেখি তোমার গায়ে কত জোর। আমিও বুঝি মারতে জানি না?

আমি খপ করে মুমুর একটা হাত চেপে ধরে কটমট করে ওর দিকে তাকালাম। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, চল, আগে গ্রামটা ঘুরে আসি চট করে। বেশি বেলা হলে চড়া রোদ উঠে যাবে। বিকেলে পাহাড়ে উঠব।

মুমু এবার দৌড়তে লাগল আমার সঙ্গে। এ-সবই আমাদের খেলা।

পিঁজরাল গ্রামে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। এখানকার সব লোকই এর মধ্যে জেগে গেছে। একটা গোয়ালে গরুর দুধ দোয়াবার চ্যাঁ চোঁ শব্দ হচ্ছে। সরু রাস্তা দিয়ে ছোটাছুটি করছে মুরগি।

এক জন কালো পাথরের তৈরি মূর্তির মতো লোক একটা ছোট মোষের বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, ও মাঝি, ফুলমণি কোন বাড়িতে থাকে?

লোকটি একটুও অবাক হল না, কোনও রকম কৌতূহলও প্রকাশ করল না। খানিকটা এগিয়ে একটা মেঠো পথ দেখিয়ে বলল, হুঁই যে তালগাছ, তার পাশে।

আমার আগের অভিজ্ঞতায় জানি, সাঁওতালরা খুবই অতিথিপরায়ণ হয়, মানুষকে সহজেই বন্ধু ভাবে নেয়। কোনও কারণে ওরা খেপে গেলেই মুশকিল। বাইরের কিছু লোক নানা ধরনের বাঁদরামি করে ওদের খেপে যাবার কারণও ঘটিয়েছে।

তালগাছটা পর্যন্ত যাবার আগেই একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল বাসন্তী।

সে হাসিমুখে বলল, আরে ছোটোবাবু, ফুলমণির খবর নিতে এসেছে বুঝি?

নিজের ওপর পুরো দায়িত্ব না দিয়ে আমি বললাম, বড়বাবু পাঠালেন। ও আর কাজ করবে কিনা জানা দরকার। না হলে নতুন লোক নিতে হবে।

বাসন্তী মুমুর দিকে চেয়ে বলল, কী সোন্দর বিটিয়া। তোমার মেয়ে বুঝি?

মুমু লাজুক ভাবে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম, আমাকে এত বুঢঢা ভাবিস বুঝি? আমার এত বড় মেয়ে থাকবে কী করে? এ তো বড়বাবুর মেয়ে।

বাসন্তীকে নিয়ে আমরা ঢুকলুম ফুলমণির বাড়ির আঙিনায়।

কোন সাঁওতালের বাড়িই আমি অপরিচ্ছন্ন দেখিনি। যত গরিবই হোক, ওরা ঘর-দোর-উঠোন ঝকঝকে তকতকে করে রাখে। মাটির বাড়ির দেওয়ালেও এক ময়লা দাগ থাকে না।

এ বাড়ির উঠোনে একটা খাটিয়ার ওপর বসে আছে এক বৃদ্ধ। মাথার চুল ধপধপে সাদা, চোখে একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা, তার কাঁচ এত মোটা যে বৃদ্ধটি প্রায় চোখে দেখতে পায়ই না বলা যেতে পারে। বৃদ্ধটির হাতে একটা হুঁকো।

আমাদের পায়ের শব্দ পেতেই বৃদ্ধটি মুখ ফিরিয়ে বললেন, কউন?

আমি বললাম, নমস্কার।

বৃদ্ধটি এবার চোখ কুঁচকে আমাদের দেখার চেষ্টা করে পরিষ্কার বললেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম, ছোটপাহাড়ি থেকে। এ বাড়ির ফুলমণি সেখানে কাজ করে। অনেক দিন যাচ্ছে না।

বাসন্তী বৃদ্ধের কাছে গিয়ে নিজেদের ভাষায় কী সব বোঝাল।

বৃদ্ধ দু'বার মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, হাঁ? বসুন, বসুন, এই বসবার জায়গা দে।

বাসন্তী একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দুটো মাছিয়া নিয়ে এল। সে-দুটোতে আমি আর মুমু বসলাম একটা আতা গাছের নিচে।

বাড়ির পেছন দিক থেকে এবার এল ফুলমণি, তার দুহাতে মাটি লাগা। আমাদের দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আমি বললাম, কী ফুলমণি, তুমি আর কাজে যাও না কেন?

ফুলমণি মৃদু গলায় বলল, যাব।

যাক, মেয়েটা তাহলে সত্যিই বোবা নয়। এই প্রথম ও আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলল। ওর গলার আওয়াজটা খসখসে ধরনের, ইংরিজিতে যাকে বলে হাসকি ভয়েস।

বৃদ্ধ বললেন, ঘরের ছাদটা ফুটো হয়ে গেছে। সেই ছাদটা সারাকে ক'দিন ধরে। আমি তো কোনও কাজ করতে পারি না।

তারপর ব্যস্ত হয়ে বাসন্তীকে বললেন, আরে বাবুদের জন্য চা নিয়ে আয়।

আমি বললাম, না না, আমরা চা খাব না। আমরা এ-দিকে বেড়াতে এসেছিলাম, এক্ষুনি চলে যাব।

তাহলে লাড্ডু খান।

মুমু বলল, আমি এক গেলাস জল খাব।

ফুলমণি জল আনতে ভেতরে চলে গেল।

বাড়িটার মাটির দেওয়ালে নানা রকম ছবি আঁকা। রঙিন ছবি। কিন্তু এ ছবিগুলো এমন কিছু দর্শনীয় নয়। বিভিন্ন ঠাকুর-দেবতা, বজরংবলী। গোদা গোদা ধরনের। একেবারে অপটু হাতের কাজ নয়, তবে ফুলমরি আঁকা যে-ছবি দুটো আগে দেখেছি, তার সঙ্গে মেলে না।

আমি বৃদ্ধকে বললাম, ফুলমণি তো ভাল ছবি আঁকে। কোথায় শিখল?

বাসন্তী বলল, এগুলো ফুলমণির শ্বশুর এঁকেছে গো!

বৃদ্ধ বললেন, হাঁ, আমি ছবি আঁকতাম। আগে মেলায় মেলায় গিয়ে অনেক ছবি বিক্রি করেছি। এখন চক্ষে দেখি না। ভগবান চোখের রোশনি কমিয়ে দিয়েছে।

যাক। তাহলে একটা পটভূমি আছে। ফুলমণি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে ছবি আঁকতে বসেনি। বাড়িতে একটা ছবির কালচার আছে। শ্বশুরের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে, কিছু শিখেছে। ওর ভেতরে ছবি আঁকার বীজ ছিল, সেটা জল-মাটি পেয়েছে। অনেক সময় শিষ্য ছাড়িয়ে যায় গুরুকে। তাই দেয়ালের এই গোদা গোদা ছবির চেয়ে ফুলমণির ছবির অনেক তফাৎ!

বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, ওর মরদ কোথায়?

বাসন্তী ডান হাতটা দু'বার ঘোরাল। অর্থাৎ নেই। কিন্তু বিয়ে হয়নি, না মরদ ওকে পরিত্যাগ করেছে, না মরে গেছে, তা ওই একটা ইঙ্গিত থেকে বুঝব কী করে? তবে শ্বশুর যখন আছে তখন বিয়ে হয়েছিল নিশ্চয়ই।

ফুলমণি দুটো কাঁসার গেলাস, এক ঘটি জল ও একটা কলাই করা প্লেটে কয়েকটা তিলের নাড়ু নিয়ে এল। এরাও অতিথিকে শুধু জল দেয় না।

মুমু আমার দিকে বিপন্ন ভাবে তাকাল। অর্থাৎ সে নাড়ু খাবে না। লোরেটো স্কুলে পড়া মেয়ে তিলের নাড়ু খাবে, তিলের নাড়ুদের অত সৌভাগ্য আজও হয়নি।

আমিই একটা মুখে দিলাম। না, খেতে সত্যিই ভাল নয়। একবার একটা বাড়িতে তিলের নাড়ু গোপনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে আমাকে খুব জব্দ হতে হয়েছিল। এখানে ওসব চলবেনা।

জলটা খুব ঠাণ্ডা আর সুস্বাদু।

বৃদ্ধ বললেন, আমার আঁকা আরও ছবি দেখবেন? এই, ভিতর থেকে নিয়ে আয় না। আমি কলকাতাতেও গেছি বাবু। যামিনীবাবু ছিলেন না একজনা, যামিনীবাবু খুব বড় আর্টিস, তিনি আমার ছবি দেখেছিলেন। বাঁকুড়ায় তার বাড়িতে ডেকেছিলেন।

ফুলমণি ভেতর থেকে অনেকগুলো বড় বড় কাগজ নিয়ে এল। তাতে রঙিন ছবি আঁকা। তুলি দিয়ে আঁকা হয়েছে। একটু মলিন হয়ে গেছে ছবিগুলো।

আমরা মাছিয়া-দুটো এগিয়ে নিয়ে গেলাম বৃদ্ধের খাটিয়ার কাছে।

বৃদ্ধা চশমা খুলে ঝুঁকে পড়ে বলল, এটা কোন ছবি রে?

বাসন্তী বলল, রাম-লছমন আর সীতাজি।

বৃদ্ধ বললেন, হাঁ, এটা ভাল। হনুমানজি সমুন্দর পার হচ্ছে, সেটা দেখা?

ডিসেম্বর মাসে এসপ্লানেড় অঞ্চলে প্রচুর নতুন ক্যালেন্ডার দেখা যায়, তাতে এই ধরনের ছবি থাকে। কয়েকটা দেখার পরই একঘেয়ে লাগল। কিন্তু ভদ্রতা রক্ষার জন্য সবগুলো দেখতেই হবে। বৃদ্ধ দেখাচ্ছেনও খুব উৎসাহের সঙ্গে।

আমি একবার মুখ তুলে বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণির এ-রকম কাগজে আঁকা ছবি নেই?

বাসন্তী ফুলমণিকে বলল, নিয়ে আয় না! আছে তো! ফু

লমণি প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল।

বাসন্তী বলল, আমি আনছি।

ফুলমণি তার হাত চেপে ধরল। বাসন্তী তবু জোর করে তার হাত ছাড়িয়ে চলে গেল ভেতরে। নিয়ে এল পাঁচখানা ছবি।

প্রথম ছবিটাই সাঙ্ঘাতিক। অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, তার মাঝখানে একটা বাচ্চা মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। মাথার ওপর আকাশ। মেয়েটা ছাড়া আর কিছুই নেই বলে মাঠের মধ্যে মেয়েটার একাকিত্ব খুব দারুণ ভাবে ফুটেছে। আকাশের রঙ লাল, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো লাল, আর মেয়েটার রঙ মেরুন। রঙের এমন সাহসী ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়। ফুলমণি কি পল গগ্যার ছবি দেখেছে নাকি?

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোনটা? এটা কোনটা?

বাসন্তী বলল, সেই যে একটা ছোট মেয়ে গো। আমরা বলি, বড়কা মাঝির হারিয়ে যাওয়া মেয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, হাঁ। আমার বহু তার ছবি ফিনিশ করে না। অর্ধেক এঁকে রেখে দেয়। এই ছবিতে চার পাঁচখানা গাছ আঁকা উচিত ছিল কিনা বলুন! বৃষ্টিতে গাছের পাতা খসে পড়ছে, দু-একটা ছাগল-গরু থাকতে পারে, মেয়েটা মাঠে চরাতে নিয়ে গেছে।

আমার কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের একটা অংশ মনে পড়ল।

রাজা দুষ্মন্ত ছবি আঁকতে পারতেন। গর্ভবতী শকুন্তলাকে তিনি অন্যায় ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছেন রাজসভা থেকে, তারপর ছ'বছর কেটে গেছে, হঠাৎ এক জেলের কাছ থেকে আংটিটা ফেরত পেয়ে রাজার সামনে পড়ে গেছে। তখন রাজা দুষ্মন্ত বিরহে হা-হুতাশ

করছেন আর শকুন্তলার ছবি এঁকে সেই ছবির সঙ্গে কথা বলছেন। রাজার বিদূষক মাধব্য রাজাকে সান্ত্বনা দিতে আসেন! মাধব্য দেখলেন রাজার আঁকা ছবিটি। দুই সখীর মাঝখানে, আমগাছে হেলান দিয়ে বসে আছে শকুন্তলা। ছবিটার খুব প্রশংসা করতে লাগলেন মাধব্য। তাই শুনে রাজা বললেন, ছবিটা এখন সম্পূর্ণ হয়নি। পেছনে আঁকা হয়নি, মালিনী-নদী, দূরে একটা পাহাড়ও থাকা দরকার। ওখানে হরিণের পাল ঘুরে বেড়ায়, একটা বড় গাছের ডালে ঋষিদের পরিধেয় বল্কল ঝোলে, একটা কৃষ্ণমৃগ আর বাচ্চা হরিণ ওখানে খেলা করে, এই সবও ছবিটার মধ্যে দিতে হবে।

মাধব্য তখন মনে মনে বললেন, সর্বনাশ। এর পর লম্বা দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো ঋষিদের ভরিয়ে দিয়ে ইনি ছবিটা একেবারে নষ্ট করে ফেলবেন দেখছি।

মাধব্যের এই মন্তব্যেই বোঝা যায়, কালিদাস অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট ক্রিটিক ছিলেন।

ফুলমণির এই ছবিটায় আর একটা দাগ টানলেই ছবিটি নষ্ট হয়ে যেত। ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মাঠের মধ্যে একলা হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির কান্নাও যেন শোনা যায়।

চন্দনদা ঠিকই ধরেছিলেন। ফুলমণি সত্যিকারের শিল্পী। ছাইচাপা আগুন। প্রত্যেকটা ছবিই ভাল, কল্পনা ও রঙের খেলায় অভিনব। পুরোপুরি বাস্তব বা ফটোগ্রাফিক করেও সে আঁকেনা, ছবির বিষয়টা প্রধান হয় না, গল্প বলার চেষ্টা নেই। রেখা, রঙ ও আয়তন মিলে কিছুটা রহস্যময়তা এসে যায়।

এরকম ছবি বোঝার সাধ্য ওর শ্বশুরের নেই। অশিক্ষিত, গ্রাম্য পরিবারের এই বধূটির ক্ষমতা খানিকটা যেন অলৌকিকের পর্যায়ে পড়ে।

আমি ফুলমণির দিকে তাকালাম।

শীর্ণ চেহারায় এই অসুন্দর মেয়েটির মুখে এখন এমন একটা তীব্রতা ঝলমল করছে, যাতে একটা আলাদা রূপ ফুটে উঠেছে। অন্যদের থেকে এ মেয়েটি একেবারেই আলাদা।

মুমু ফিস ফিস করে বলল, নীলুকাকা, এই ছবিগুলো একদিনের জন্য নিয়ে যেতে দেবে? বাবাকে দেখাতাম।

মুমু আমার ঠিক মনের কথাই বলল। আমি বৃদ্ধের উদ্দেশে জোরে বললাম, ছবিগুলো আমি নিয়ে যেতে পারি? পরে ফেরত দেব!

বৃদ্ধ বললেন, আগে এক জন বাবু এসেছিল। দু'বছর আগে। কখানা ছবি নিল। বলল, আবার আসবে। আর এল না।

ও, তাহলে ফুলমণির প্রতিভার আমরাই প্রথম আবিষ্কারক নই? আগেও কেউ দেখেছে। এবং সেই আগের কারণটি এদের কাছে অবিশ্বাসের কারণ ঘটিয়েছে। এই সব আগের লোকদের নিয়ে মহা জ্বালা হয়, আগের লোকদের জন্য পরের লোকদের ভুগতে হয়।

বললাম, আমি তো ছোটপাহাড়িতেই থাকি। ফুলমণি কাজ করতে যাবে, ওকে দিয়ে দেব।

বৃদ্ধ নিজের ছবিগুলো আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, নিয়ে যান। কেউ যদি বিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনতে চায় বেচে দেবেন! যা দাম পাওয়া যায়। একশোটা টাকা পেলে একটা বকরি কিনব। বকরির দুধ খেলে আমার তাগৎ হয়।

দু'জনের আঁকা ছবিই গুছিয়ে নিয়ে একটু বাদে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ফেরার পথে মুমু বলল, এই মেয়েটার যখন খুব মন খারাপ থাকে, তখন ও ছবি আঁকে, তাই না?

আমি চমকে গেলাম। মুমুর কাছ থেকে আমি এ-রকম কথা আশা করিনি। মুমু তো ছবি-টবির ধার ধারেনা। ফুলমণিদের বাড়িতে ঢোকার মুখে ও একবার বলেছিল, বড় গোবরের গন্ধ। এতক্ষণ ওকে বসিয়ে রেখে শাস্তিই দেওয়া হয়েছে।

আমি বললাম, তাই নাকি। কী করে তুই বুঝলি?

মুমু বলল, আমার মনে হল।

হয়তো মুমু ঠিকই বুঝেছে। এই মনে হওয়াগুলোর কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না।

৫-৬. এই সব ছবি

নীপাবউদি বলল, এই সব ছবি, সত্যি একটা কামিন এঁকেছে?

চন্দনদা বলল, হ্যাঁ। নীলু ওর বাড়ি দেখে এসেছে। ওর শ্বশুরও ছবি আঁকে, সেগুলোও তো দেখলে।

নীপাবউদি বলল, এত ভাল যে আঁকতে পারে, তাকে দিয়ে তোমরা জনমজুরি করাচ্ছ? যার মাথায় রয়েছে এমন সব দারুণ ছবির আইডিয়া, তার মাথায় ইট বওয়াচ্ছ? চিনের কালচারাল রেভোলিউশানের পরেও তোমাদের শিক্ষা হল না?

চন্দনদা ছাত্রজীবনে নকশালপন্থী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে একটা খোঁচা দেওয়া হল!

চন্দনদা তর্কের মধ্যে না গিয়ে বলল, আমি কী করব বলো। এ ধরনের শিল্পীদের সাহায্য করা সরকারের কাজ। জীবিকার জন্য বেচারা ইট বওয়া ছাড়া আর কী করবে?

নীপাবউদি বলল, কেন, তোমাদের কোম্পানিও তো অনেক কিছু করে। পাহাড়ে চড়ার জন্য টাকা দেয়। আর এক জন শিল্পীকে দিতে পারে না?

মেয়েদের একটা পর্বত অভিযানের টিমকে স্পনসর করেছিল চন্দনদার কম্পানি। সেই দলের লিডার ছিল রোহিণী। সেই সময় ওই পর্বত অভিযান ও রোহিণীর সঙ্গে চন্দনদা একটু বেশি বেশি জড়িয়ে পড়েছিল। সেই ব্যাপারে আর একটি খোঁচা।

চন্দনদা আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল, যার মানে হল, ফুলমণিকে এনে একবার তোর বউদির সামনে হাজির করাতে হবে। যাতে নীপা বোঝে যে, ফুলমণির সঙ্গে প্রেম করা সম্ভব নয়।

নীপাবউদি বৃষ্টিভেজা মেয়েটার ছবিটা তুলে ধরে বলল, এই ছবিটা আমার এত ভাল লাগছে, রেখে দিতে ইচ্ছে করছে। এটা যদি আমি কিনে নিই?

লালুদা এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, যদিও চুপ করে থাকা তার স্বভাব নয়। এবারে ছবি বিষয়ে নীপাবউদিরমতামত সবটা শুনে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, কেননা না, কেননা! কত দাম? সত্যিই অসাধারণ ছবি। একসেলেন্ট। মাস্টারপিস। কত দাম দিতে হবে, বলো না নীলমাধব! দুটোও তো কেনা যেতে পারে। এইটা আর ওইটা।

লালুদা অন্য হাতে হনুমানের সমুদ্র পার হবার ছবিটা তুলে ধরল।

নীপাবউদি বললো, ধ্যাৎ। ওটা তো ওর শ্বশুরের আঁকা, একেবারে বাজে। দুটো ছবির তফাৎ বোঝেন না?

লালুদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, অফকোর্স তফাৎ আছে! খুবই তফাৎ। কোনও তুলনাই চলে না। বাচ্চা মেয়েটার ছবি, অপূর্ব, অপূর্ব! এটা কিনে ফেলা যাক। নীলাচল, কত দাম দিতে হবে? বেশি করে বলো, যাতে মেয়েটির সাহায্য হয়।

নীপাবউদি বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, একবার মেয়েটিকে কিছু টাকা দিলে এমন কী সাহায্য হবে? ওর আত্মীয় স্বজনরা সেই টাকা খেয়ে ফেলবে। একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে আজেবাজে কাজ ছেড়েও শুধু ছবি আঁকতে পারে। গভর্নমেন্টের কোনও স্কলারশিপ-টলারশিপ জোগাড় করা যায় না?

চন্দনদা বলল, এমনি এমনি কি হয়? একটা একজিবিশন করা দরকার, ক্রিটিকদের মতামত দরকার। সে-সব এখানে বসে কে করবে? কে ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাবে?

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ায় চন্দনদা থেমে গেল। একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে হেসে নিয়ে বলল, একটা কাজ করা যেতে পারে। শিগগিরই আমি কলকাতায় যাব। শুককুরবার মহরমের ছুটি, শনিবারটা ম্যানেজ করলে পর পর তিন দিন, নীলু, তুইও আমার সঙ্গে

কলকাতায় যেতে পারিস। ছবিগুলো নিয়ে চল। আমি তো সময় পাবনা, তুই কয়েক জনকে দেখিয়ে আন।

সেই রকমই ব্যবস্থা হল। লালুদার ছোট গাড়িতে জায়গা হবে না। তাই এক সঙ্গেই বেরিয়ে চন্দনদা আর আমি এলাম ট্রেনে, অন্যরা গেল গাড়িতে।

কলকাতায় কোনও বড় আর্টিস্ট কিংবা ক্রিটিককে আমি চিনিনা। মানে, আমি অনেককে চিনি, কিন্তু তারা আমাকে চেনেন না। এ পর্যন্ত কখনও কোনও শিল্পীর বাড়িতে যাইনি।

শিল্পী শান্তনু চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে আমি হতাশ।

গলফগ্রিনের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি, চন্দনদাই নিয়ে গেল সেখানে। চন্দনদার সঙ্গে তার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। সারা ভারতেই তার খ্যাতি, খুব ব্যস্ত মানুষ, তাই টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছিল।

শিল্পীদের চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরি হয়ে আছে। গল্প উপন্যাসে, সিনেমার আসরে সেইরকম শিল্পীদেরই দেখি, তারা বোহেমিয়ান, মাথায় বাবরি চুল, মুখে। দাড়ির জঙ্গল, মদের নেশায় সব সময় চোখ লাল, পোশাক উদ্ভট, তাদের স্টুডিয়োতে সব কিছু এলোমেলো ভাবে ছড়ানো, মেয়েদের নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলেন।

কোথায় কী! শান্তনু চৌধুরীর ফ্ল্যাটটা নিখুঁত ভাবে সাজানো, মাথায় অল্প টাক, দাড়ি কামানো, ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা, ফর্সা, গোলগাল চেহারায় তাকে মনে হয় একবিশিষ্ট ভদ্রলোক। বসবার ঘরটির দেয়ালে একটি মাত্র ছবি, দেলাক্রোয়ার একটি ছবির বড় প্রিন্ট। এখনও যে দেলাক্রোয়ার এরকম কোনও ভক্ত আছে, তা আমার জানা ছিল না।

বসবার ঘরে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর শিল্পী নিজেই এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্টুডিওতে। উত্তর আর পূর্ব ধার খোলা একটা বড় ঘর, দেয়ালের গায়ে ঠেসান দেওয়া বেশ কয়েকটি ক্যানভাস, ইজেলে একটি অসমাপ্ত ছবি। আগেই শুনেছি, শান্তনু চৌধুরী প্রতি দিন নিয়ম করে আঁকেন, মাসে অন্তত দুটি অয়েলের ছবি শেষ করেন। তার এক-একটি ছবির দাম অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা।

চন্দনদার সঙ্গে কথায় কথায় তিনি জানালেন যে, তার এই স্টুডিওতে আর কুলোচ্ছে না, এই গলফ গ্রিনেই তার নিজস্ব একটা বাড়ি হচ্ছে, সম্পূর্ণ তিন তলা জুড়ে হবে স্টুডিও। চন্দনদাকে বাড়ির প্ল্যান দেখিয়ে অভিমত নিলেন, সিমেন্ট ও ইটের দাম কত যাচ্ছে তার খোঁজখবর জানালেন। তারপর আমরা তার ছবিগুলো দেখলাম। ছবি তিনি খুবই ভাল আঁকেন, রঙের ব্যবহার অসামান্য, শিগগিরই তার এই সব ছবির একটা বড় প্রদর্শনী হবে দিল্লিতে।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে।

চন্দনদা আমাকে বলল, নীলু, এবার বার কর।

শান্তনু চৌধুরী ঈষৎ চঞ্চল হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ছবি আঁকো নাকি?

চন্দনদা বলল, না না, ও আঁকে না, ছোটপাহাড়িতে একটি আদিবাসী মেয়ে...।

ফুলমণির কাহিনিটা বলতে লাগল চন্দনদা, শান্তনু চৌধুরী অন্যমনস্ক ভাবে শুনতে শুনতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, তাই নাকি? বাঃ ইন্টারেস্টিং। দেখি, দেখি, ছবিগুলো দেখি।

আমি ছবিগুলো মেলে ধরলাম।

শান্তনু চৌধুরী ছবিগুলোর দিকে দ্রুত চোখ বোলালেন, তার মুখের কোনও ভাবান্তর হল না।

তিনি বললেন, বাঃ, বেশ ভাল, বেশ ভাল!

বৃষ্টিভেজা মেয়েটির ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে চন্দনদা জিজ্ঞেস করল, এটা কীরকম লাগছে?

শান্তনু চৌধুরী একই সুরে বললেন, বেশ ভাল, বেশ ভাল।

চন্দনদা জিজ্ঞেস করল, ছবিগুলোর বিশেষ কোনও গুণ আছে বলে আপনার মনে হয়?

শান্তনু চৌধুরী বললেন, বললাম তো, ভালই এঁকেছে। এক জন আদিবাসী মেয়ের পক্ষে, ভালই বলতে হবে।

তারপরই প্রসঙ্গ পালটে বললেন, আপনাদের কোম্পানি এবার কারছবি দিয়ে ক্যালেন্ডার করছে?

চন্দনদা বলল, খুব সম্ভবত হেমেন মজুমদারের। ওঁর ফ্যামিলির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। এসব তো আমি একা ঠিক করি না। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

শান্তনু চৌধুরী খুব চাপা বিদ্রুপের সুরে বললেন, ওঃ, হেমেন মজুমদার? আচ্ছা!

বেশ বেশ। এরপর তিনি আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যেটা স্পষ্ট উঠে যাওয়ার ইঙ্গিত।

বোঝাই গেল, ফুলমণির ছবিগুলোকে উনি কোনও গুরুত্বই দেননি। যেটুকু প্রশংসা করেছেন, তা নিছক ভদ্রতার। তবে কি ফুলমণির ছবি নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করছি? আমাদের উচ্ছাস সবটাই ভুল!

দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে শান্তনু চৌধুরী বললেন, অনেক ইয়াং ছেলে মেয়ে আমাকে ছবি দেখাতে চায়, আমি সময় পাই না, সকলের জন্য সময় দিতে গেলে আমার নিজের কাজ...তবে যত দূর সম্ভব চেষ্টা করি সাহায্য করার।

আমাদের মুখে আর কথা নেই। ফুলমণি সামান্য মনোযোগেরও অযোগ্য। বাইরে বেরিয়ে আমি খানিকটা রাগের সুরে বললাম, চন্দনদা, শান্তনু চৌধুরীর এত নাম, কিন্তু দেখলে শিল্পী বলে মনেই হয় না। মনে হয়, কোনও বড় অফিসার!

চন্দনদা বলল, তুই বুঝি ভেবেছিলি, সকালবেলাতেই মাতাল হয়ে একটা মেয়ের গলা জড়িয়ে বসে থাকবে? ও-সবনাইনটিথ সেঞ্চুরির ধারণা! তখন একটা বোহেমিয়ানিজম আর খ্যাপামির যুগ ছিল। এখন শিল্পীরাও সামাজিক মানুষ। মাতলামি আর বেলেল্লাপনা করলে সীরিয়াস কাজ করা যায় না এ যুগে। কী দারুণ কমপিটিশন! ছবি আঁকাও অন্য আর পাঁচটা কাজের মতো একটা কাজ।

একথাটা আমার পছন্দ হল না। ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, এ-সব কিছুতেই অন্য কাজের মতো নয়। তাহলে চেষ্টা করলেও সবাই পারে না কেন? যারা পড়াশুনোয় ফার্স্ট হয়, তারা কি এগুলো পারে? চন্দনদাই আগে উলটো কথা বলেছে।

আমরা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এই সময় এক জন কেউ বলল, এই চন্দন, এখানে কোথায় এসেছিলি?

একজন প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ছিপছিপে ভদ্রলোক, ব্রোঞ্জের মতো গায়ের রঙ, তীক্ষ্ণ নাক, কৌতূহলী চোখ, দাড়ি কামানো, কিন্তু মাথার চুল বড় বড়, প্যান্টের ওপর ফতুয়া জাতীয় একটা জামা পরা, হাতে একটা ছড়ি, তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে।

ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, ঋজু শরীর, হাতে ছড়ি নেবার কথা নয়, ওটা বোধহয় স্টাইল করার জন্য।

তিনি আবার বললেন, শান্তনুর কাছ থেকে ছবি কিনতে এসেছিলি বুঝি? কত টাকা খসল?

চন্দনদা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, নীলু, এ হচ্ছে অনিন্দ্য দাস। আমরা স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি।

নাম শুনেই চিনতে পারলাম। ইনিও খুবই বিখ্যাত শিল্পী। কয়েক বছর আগে একটা ফরাসি কাগজে এর সম্পর্কে একটা বড় আর্টিকেল বেরিয়েছিল ছবি-টবি দিয়ে, তার অনুবাদ আবার ছাপা হয় বাংলা কাগজে। ফরাসি দেশের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেই এঁকে নিয়ে পড়ে যায় কলকাতায়।

চন্দনদা বলল, না রে, ছবি কিনতে আসিনি। শান্তনু চৌধুরীকে কয়েকটা ছবি দেখাতে এসেছিলাম।

তুই আবার ছবি আঁকছিস বুঝি? আবার ইচ্ছেটা চাগিয়েছে? টাকা তো কম বোজগার করিস না।

ধ্যাৎ, আমি কী আঁকব। এগুলো একটা আদিবাসী মেয়ের। আমাদের ভাল লেগেছিল, তাই শান্তনু চৌধুরীকে দেখিয়ে মতামত জানতে এসেছিলাম।

শালা, তুই আমাকে আগে দেখাসনি কেন? তুই কাকে বেশি দিন চিনিস, আমাকে, না শান্তনুকে? শান্তনু বড় আর্টিস্ট?

তোর কথাটা মনে পড়েনি, মানে, তুই তো মেইনলি স্কালপটর, তুই মূর্তি গড়িস।

স্কলপচার করি বলে ছবি বুঝি না? স্কালপটররা ছবি আঁকে না? তোদের রদ্যাঁ ছবি আঁকেনি? দেবীপ্রসাদ, রামকিঙ্কর ছবি আঁকেনি?

আমার দিকে ছড়িটা তুলে অনিন্দ্য দাস বললেন, এই ছেলে, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কী, বার কর ছবিগুলো।

শান্তনু চৌধুরীর তুলনায় অনিন্দ্য দাসকে প্রায় প্রথম নজরেই আমার ভাল লেগে গেল। প্রাণবন্ত মানুষ, মিষ্টি মিষ্টি ভদ্রতার ধার ধারেন না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করে ছবি দেখাব! চন্দনদার গাড়ির বনেটের ওপর মেলে ধরলাম।

অনিন্দ্য দাস বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই পাঁচটা ছবি দেখলেন। তারপর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কে এঁকেছে?

চন্দনদা ফুলমণির বৃত্তান্ত সবিস্তার বলতে যেতেই অনিন্দ্য দাস তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায়?

সে তো ছোটপাহাড়িতে থাকে।

তাকে নিয়ে আয়।

সেটা খুব মুশকিলের ব্যাপার। আচ্ছা অনিন্দ্য, বল তো, এই ছবিগুলো ঠিক কেমন? মেয়েটার সত্যিই কোনও ট্যালেন্ট আছে?

ধুস! বোগাস! এ-রকম ছবি যে-কেউ আঁকতে পারে। আর্টিস্টকে না দেখলে, তার সঙ্গে কথা না বললে কি ছবি বোঝা যায়? তার কতটা ভিশান আছে, তার ডেপথ কতটা, তার স্ট্রাগল করার ক্ষমতা, এ-সব না বুঝলে শুধু ক'টা ছবি দেখে কী হবে?

আঁকার ক্ষমতা, নতুনত্ব আছে কি না, সেটুকু তো অন্তত- ।

আবার বাজে কথা বলছিস, চন্দন! এ কি ইম্প্রেশানিস্টদের ছবি যে, প্রত্যেকটা ছবিরই আলাদা একটা প্রাণ আছে, আলাদা একটা সত্তা আছে? কে এঁকেছে তা বলে দেবার দরকার হয় না, প্রত্যেকটা ছবিই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমি বললাম, সব ভাল ছবিই তো এ-রকম হয়। ছবি দেখে যা মনে হয়।

অনিন্দ্য দাস এক ধমক দিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না ছোকরা, তর্ক কোরোনা। যা বলছি শুনে যাও।

আমি তবু প্রতিবাদ করে বললাম, আর্টিস্টদের দেখে, কথা বললেও তো মনে হয় না।

অনিন্দ্য দাস ঠিক আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে এবার হে-হে করে হেসে ফেললেন। শান্তনু চৌধুরীর বাড়ির দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললেন, ছবি আঁকলেই কি শিল্পী হওয়া যায়? শান্তনু খুব নাম করেছে, ভালই আঁকে, নিশ্চয়ই ভাল আঁকে, কিন্তু সবই রঙের পোঁচ, বুঝলে, রঙের পোঁচ! ওর মধ্যে যে ফাঁকিবাজি আছে, তা আমরা বুঝি, তোমরা বুঝবে না। স্কালপচার করতে গেলে কব্জির জোর লাগে, আর লাগে এই দুটো এক সঙ্গে।

অনিন্দ্য দাস নিজের মাথায় আর বুকে দুটো টোকা দিলেন।

তারপর চন্দনদাকে বললেন, তুই বুঝি শান্তনুর ছবি দিয়ে তোদের কোম্পানির ক্যালেন্ডার করবি ভাবছিস? দে, যত ইচ্ছে তেল দে! কেন, স্কালপচার দিয়ে বুঝি ক্যালেন্ডার করা যায় না? শালা বাঙালিরা ভাস্কর্যের কিছুই বোঝে না। কেষ্ট নগরের পুতুল দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। কলকাতা শহরে যে-মূর্তিগুলো বসিয়েছে, ইচ্ছে করে লাথি মেরে সেগুলো সব ভেঙে দিই।

অনিন্দ্য দাস শান্তনু চৌধুরীর বাড়িতেই যাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে, উনি শান্তনু চৌধুরীকে একটুও পছন্দ করেন না। তবু দু'জনে নিশ্চয়ই এখন হেসে হেসে গল্প করবেন।

গাড়িতে উঠে চন্দনদা বিমর্ষভাবে বলল, কী হল রে নীলু। দু-দুজন বিখ্যাত আর্টিস্ট এ ছবিগুলোকে তো পাত্তাই দিল না। আমরা তাহলে বোকার মতো নাচানাচি করেছি?

কোনও নিরপেক্ষ আর্ট ক্রিটিককে একবার দেখালে হয় না?

তুই যে অদ্ভুত কথা বললি রে নীলু। নিরপেক্ষ ক্রিটিক বলে পৃথিবীতে কোনও বস্তু আছে নাকি? সব ক্রিটিকই কোনও না কোনও দিকে হেলে থাকে।

খবরের কাগজে যাঁরা সমালোচনা লেখেন।

তুই দেখবি, একই শিল্পীর ছবি, স্টেটসম্যান যাচ্ছেতাই বলে উড়িয়ে দিচ্ছে আর আনন্দবাজার তাকেই মাথায় তুলে নাচছে। আবার এর উলটোটাও হয়। ছবির জগতে যে-রকম গ্রুপিজম আছে, তা তোর-আমার বোঝার সাধ্য নেই।

তবু তো কিছু কিছু শিল্পীর সারা দেশেই নাম ছড়িয়ে যায়। তাদের ছবির কদর হয়।

সে হচ্ছে জনসাধারণের বিচার। জনসাধারণই তো আলটিমেট ক্রিটিক। কিন্তু ফুলমণির ছবি জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার কোনও উপায় নেই। কষ্টে সৃষ্টে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেও কেউ আসবে না, ক্রিটিকরা পাত্তা দেবেনা। আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায় প্রদর্শনী হয় প্রতি সপ্তাহে। বিরাট করে পাবলিসিটি দিতে হবে, উদ্বোধনের দিন মস্ত পার্টি দিয়ে মদের ফোয়ারা বইয়ে দিতে হবে, তবে তো গণ্যমান্যরা আসবে!

তাহলে আর কিছু করা যাবে না?

নাঃ।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর চন্দনদা জিজ্ঞেস করল, তোর মন খারাপ লাগছে না নীলু?

হুঁ।

কেন মন খারাপ লাগছে জানিস? আমরা সবাই ভেতরে ভেতরে স্বার্থপর। ফুলমণির ছবির কিছু হলনা, সেজন্য আমরা যতটা না দুঃখিত, তার চেয়ে বেশি দুঃখিত এই জন্য যে, আমরা ওর উপকার করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম, সেটা ব্যর্থ হল! আমরা হেরে গেলাম। তাই না!

তা-ও বলা যেতে পারে।

মন খারাপ হলে আমার কাবাব আর পরোটা খেতে ইচ্ছে করে। খাবি?

কাবাব আর পরোটা খুব আনন্দের সময়েও খেতে আমার কোনও আপত্তি থাকে না।

তাহলে চল পার্ক সার্কাসের দিকে। ওখানে একটা ভাল রেস্তোরাঁয়।

হঠাৎ থেমে গিয়ে চন্দনদা গাড়ির ড্রাইভারকে বলল, এই, এই, গাড়ি ঘোরাও, চলো তো একবার আলিপুরের দিকে।

আমার বিস্ময় দেখে বলল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল রে। সিরাজুল তারিক-এর বাড়ি গিয়ে একবার কাবাব খেয়েছিলাম, কী অপূর্ব তার স্বাদ, এখন জিভে লেগে আছে।

এখন হঠাৎ তার বাড়িতে গেলেও কি তিনি কাবাব খাওয়াবেন নাকি?

তুই কী ইডিয়েট রে! নাম শুনে চিনতে পারলিনা? সিরাজুল তারিক।

মানে, যিনি আর্টিস্ট?

তাছাড়া সিরাজুল তারিক আবার কজন আছে? আমার সঙ্গে এক দিন আলাপ হয়েছিল। বার বার তিনবার। ওঁর মতামতটাও নেওয়া যাক। উনিও যদি উড়িয়ে দেন, তাহলে ফুলমণির ছবি নিয়ে আমরা আর মাথাই ঘামাবনা।

কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে গেলে কি উনি সময় দেবেন?

একটা জিনিস লক্ষ্য করলি তো। বড় কোম্পানির ক্যালেন্ডারে ছবি দেখার জন্য আর্টিস্টরা বেশ ব্যস্ত। অন্তত লাখ খানেক টাকা তো পাওয়াই যায়। সিরাজুল সাহেবকে প্রথমে সেই টোপটা দেব। তাহলে ঠিকই সময় পাবেন কথা বলার।

ঠিক আলিপুর নয়, খিদিরপুর ব্রিজের কাছাকাছি সিরাজুল তারিকের পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। ইনি বাংলার প্রবীণ, বিখ্যাত শিল্পীদের অন্যতম। মতামতের দিক থেকে খানিকটা ট্র্যাডিশনাল। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে ওঁর একটা সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। উনি অল্প বয়সে অয়েলের কাজ কিছু করেছেন, এখন আর অয়েল ছোঁন

না। ওয়াটার কালার আর ওয়াশ-এর কাজই বেশি করেন। আজকালকার অনেক শিল্পীর মতো উনি অ্যাক্রিলিকের চকচকে রঙ একেবারে পছন্দ করেন না। অয়েল সম্পর্কে উনি একটা গল্পও বলেছেন। আমাদের দেশে তো আগে অয়েলের কাজ হত না। জাহাঙ্গির বাদশার দরবারে ইংরেজদের দূত হিসেবে গিয়েছিলেন স্যার টমাস রো। অনেক রকম উপহার-উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। জিনিসগুলো খুলে খুলে দেখাচ্ছেন। তার মধ্যে একটা অয়েল পেইন্টিং ছিল। সেটা দেখে জাহাঙ্গির বাদশা মুখ কুঁচকে বলেছিলেন, ওটা সরিয়ে নাও, বড্ড চকচক করছে।

ওয়াশ-এর ছবির মতোই সিরাজুল তারিক মানুষটি শান্ত, স্নিগ্ধ। চোখ দুটি আশ্চর্য মায়াময়।

নিজেই তিনি দরজা খুলে দিয়ে আমাদের ভেতরে বসালেন। সরু পাজামা ও গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরা, মুখে ধপধপে সাদা দাড়ি, মাথার চুলও সাদা, তবে বেশ পাতলা হয়ে গেছে। গলায় ঝুলছে কালো সুতোয় বাঁধা চশমা। কথা বলেন খুব নরম গলায়। তাকে দেখলে ঋষি দরবেশদের কথা মনে পড়ে।

সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পী এম এফ হুসেনের চেহারার খানিকটা মিল আছে। কিন্তু হুসেন ফাইভ স্টার হোটেলে উঠলেও রাস্তা দিয়ে খালি পায়ে হাঁটেন, খবরের কাগজের হেডলাইন দেখে সঙ্গে সঙ্গে ছবি এঁকে ফেলেন, এই সব গিমিক সিরাজুল সাহেবের চরিত্রে একেবারেই নেই। তার ছবির বাজারদর বেশ ভাল। তবু তিনি আগেকার চালচলন পালটাননি, পুরনো বাড়িটা ছাড়েননি। নিরিবিলিতে থাকতে পছন্দ করেন।

চন্দনদার ক্যালেন্ডারের প্রস্তাবটাকে উনি আমলই দিলেন না। হেসে বললেন, না না। আমি ছবি দেব কী করে? আমি বছরে পাঁচ-সাতখানার বেশি ছবি আঁকি না। কেউ অর্ডার দিলে তাড়াতাড়ি এঁকে দিতেও পারি না। ছবি আঁকবো কী, ফাঁকা ক্যানভাসের সামনে বসে থাকতে থাকতেই দিন কেটে যায়। কত ছবি চোখে ভাসে। সেগুলো এঁকে ফেলার

চেয়ে সেগুলো নিয়ে কল্পনায় খেলা করতেই বেশি ভালবাসি। আমার যে ক'খানা ছবি বিক্রি হয় আপনাদের দয়ায়, তাতে বেশ চলে যায়।

চন্দনদা তখন বলল, আমি একটি মেয়ের আঁকা কয়েকটি ছবি এনেছি। অনুগ্রহ করে একটু দেখবেন?

সিরাজুল সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, অবশ্যই। নিজের ছবি আঁকার চেয়েও ছবি দেখতেই আমি বেশি পছন্দ করি।

প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট ধরে তিনি ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন। একটাও কথা বললেন না। আকাশে মেঘ জমেছে, তিনি আলো জ্বেলে দিলেন ঘরের। ছবিগুলো নিয়ে একবার জানালার কাছে গেলেন, একবার আলোর নিচে ধরলেন, নিজের ইজেলে চাপিয়েও দেখলেন।

তারপর বিহ্বল চোখে চন্দনদার দিকে চেয়ে বললেন, এ আমাকে কী দেখালেন ঘোষালবাবু? এ ছবি কে এঁকেছেন?

চন্দনদা নার্ভাস গলায় বলল, এ ছবিগুলো কী ভাল? এর কোনও মূল্য আছে?

সিরাজুল সাহেব বললেন, ভাল মানে কী! আমার আজকের সকালটা ধন্য হয়ে গেল। অসাধারণ। তুলনা নেই। আর মূল্যের কথা বলছেন? এই প্রত্যেকটা ছবির জন্য আমি পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে রাজি আছি। দেবেন আমাকে?

.

০৬.

এত দ্রুত যে ব্যাপারগুলো ঘটবে তা আমি ধারণাও করতে পারিনি।

সিরাজুল সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ হল আকস্মিক ভাবে। খুব ছোটখাটো ঘটনা থেকে কোনও মানুষের নিয়তিটাই বদলে যেতে পারে। চন্দনদার যদি হঠাৎ কাবাব-পরোটা খাবার কথা মনে না পড়ত, তাহলে সিরাজুল সাহেবের কাছে আসাই হত না। কিংবা, ফুলমণি যদি ছোট পাহাড়ির বদলে জামসেদপুরে ইট বওয়ার কাজ করতে যেত, তাহলে সে চন্দনদার নজরে পড়ত না, তার ছবি আঁকা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না।

সিরাজুল সাহেব আমাদের ছাড়লেন না, দুপুরে তার বাড়িতেই খেতে হল। কাবাব-পরোটা নয় অবশ্য, ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ ও ডিমভরা কই মাছের ঝোল। খুব সম্প্রতি তিনি সব রকম মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

ছবিগুলো সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত।

আমাদের তিনি বোঝালেন ছবিগুলোর বিশেষত্ব কোথায়। যে-কোনও শিল্পীই তার কাছাকাছি পরিবেশ, মানুষজন ও প্রকৃতির যে-বাস্তবতা, তা ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য। সমসাময়িক বাস্তবতা সব শিল্পের ভিত্তি। তবে নিছক বাস্তবতা নয় এবং নিছক সমসাময়িকতাও নয়। তারমধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা ও চিরকালীনতার ছোঁয়া লাগলেই তা সার্থক শিল্প হয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, যেমন ধরুন, হ্যামলেট। এর কাহিনিটা আসলে কী? ডেনমার্কের একটা ছোট্ট রাজ্যের রাজপরিবারের ঘরোয়া কোন্দল। কিন্তু পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের মানুষ ওর রস অনুভব করতে পারে। কিংবা ধরুন মোনালিসার মুখখানা। লিওনার্দো তো এক জন ইতালিয়ান মহিলার মুখ এঁকেছেন, তার চোখের সামনে ছিল সমসাময়িক বাস্তবতা, তবু ওই মহিলার মুখের হাসি চিরকালীন হয়ে গেল।

আমি বললাম, সিরাজসাহেব, এক আদিবাসী মহিলার ছবি প্রসঙ্গে হ্যামলেট আর মোনালিসার প্রসঙ্গ টানা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

সিরাজসাহেব প্রশংসার ব্যাপারে কার্পণ্য বিশ্বাস করেন না। তিনি বললেন, কেন তুলনা করা যাবে? আমরা সবাই তো আদিবাসী, তাইনা? এখানে দেখুন, এই মহিলাটিকে

কাছাকাছি যেসব মানুষজন দেখেছে, গাছপালা, গোরু-মোষ, এই সবই এঁকেছে। ফোক ট্র্যাডিশনও আছে তার রেখার মধ্যে। যামিনী রায়ের মতো মোটমোটা দাগ। ড্রয়িংয়ে হাত পাকা, কিন্তু নিখুঁত ড্রয়িং করেনি, স্টাইলাইজড। এই যে তিনটে মোষ, এই মোষগুলো ছোটপাহাড়ি নয়, সারা পৃথিবীর। এ মেয়েটির অন্তদৃষ্টি আছে। এ বড় দুর্লভ, বুঝলেন, খুবই দুর্লভ।

আমি এবার ফস করে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনি তো এত প্রশংসা করছেন, কিন্তু শান্তনু চৌধুরী আর অনিন্দ্য দাস একেবারে পাত্তাই দিলেন না কেন? তারাও তো বড় শিল্পী, তাঁরা এ ছবিগুলোর মধ্যে কোনও গুণই দেখতে পেলেন না।

সিরাজসাহেব চুপ করে গেলেন।

তিনি এতই ভদ্র যে সমসাময়িক কোনও শিল্পী সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে চান না।

চন্দনদা বলল, ওঁদের অ্যাটিচুডটা আমি বুঝতে পেরেছি। ওঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না নীলু। কোনও কোনও শিল্পী হয় খুব সেলফ সেনটারড। নিজের ছবি ছাড়া আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের সৃষ্টি নিয়েই মগ্ন থাকে। আবার কেউ কেউ গোটা শিল্পজগতে নতুন কিছু ঘটলেই তারা খুশি হয়ে ওঠে। আমি ঠিক বলছি না সিরাজসাহেব?

সিরাজসাহেব আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

এরপর তিনি আর একটি চমকপ্রদ কথা বললেন।

চন্দনদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছোটপাহাড়িতে কী করে যেতে হয়? আমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চাই। আজই যাওয়া যায় না?

চন্দনদা বলল, আপনি যাবেন সেখানে?

হ্যা। শুধু এই পাঁচখানা ছবি দেখলেই তো চলবে না। ও আরও কী কী ছবি এঁকেছে দেখতে হবে। ওর আঁকার পদ্ধতিটাও জানা দরকার। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই!

ঠিক আছে, আপনি চলে যান না নীলুর সঙ্গে। আমি সব ব্যবস্থা কবে দিচ্ছি। আমার অফিসের দু একটা কাজ, আমাকে থাকতে হবে কলকাতায়। নীলু তো আজই ফিরছে।

আমি যেতে চাই, তার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে ঘোষালবাবু। সামনের সপ্তাহে অ্যাকাডেমিতে সারা বাংলা তরুণ শিল্পীদের একটা বড় প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। ছবি বাছাইয়ের ভার দেওয়া হয়েছে আমার ওপর। আমি এই মেয়েটিকে সুযোগ দিতে চাই। ওর একটা এক্সপোজার হবে। অন্য সব শিল্পীদের ছবির পাশে ওর ছবিও থাকবে, লোকে দেখবে। লোকেরাই ওর বিচার করুক।

এ তো অতি চমৎকার ব্যাপার। এমন সুযোগ তো আশাই করা যায় না! আমাদের আর কিছু বলতে হবে না। শিল্প-রসিকরাই ওর বিচার করবে।

মেয়েটিকে কলকাতায় আনা যাবেনা? প্রদর্শনীতে অন্য শিল্পী সবাই থাকবে!

কেন আনা যাবে না? ওর ভাড়ার টাকা আমি দিয়ে দেব। থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে!

এবার আমি বাধা দিয়ে বললাম, চন্দনদা, ফুলমণি কি আসতে চাইবে? এত লাজুক, কথাই বলতে চায় না, কোনও দিন নিজের জায়গা ছেড়ে বাইরে যায়নি।

সিরাজুল সাহেব বললেন, আমি বুঝিয়ে বলব। আমি তো যাচ্ছি।

চন্দনদা জোর দিয়ে বলল, তাকে আসতেই হবে, যদি সে সত্যিই শিল্পী হতে চায়। শুধু ঘরে বসে ছবি আঁকলেই তো চলে না। শিল্পীকে ছবির ফ্রেমিং পর্যন্ত শিখতে হয়। অন্য কে কী-রকম আঁকছে তা জানতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতার জগতটাকে বাড়াতে হয়। এই সবই পার্ট অফ দ্য গেইম। ফুলমণি যদি আসতে না চায়, ছবিগুলো তাকে ফেরত দিয়ে

আসবি। বাকি জীবন তাহলে সেইট বওয়া কুলি হয়েই কাটাক। সিরাজুল তাবিকের মতো এত বড় একজন শিল্পী নিজে তার কাছে যেতে চাইছেন।

সিরাজুল সাহেব বললেন, আচ্ছা, আগে গিয়েই দেখা যাক না।

চন্দনদা রয়ে গেল কলকাতায়। সিরাজুল সাহেবকে নিয়ে আমি ছোটপাহাড়ি পৌঁছলাম পরদিন দুপুরবেলা। গেস্ট হাউসে একটা ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমি বললাম, আপনি খেয়ে-দেয়ে এখন বিশ্রাম নিন। কাল সকালবেলা যাওয়া যাবে ফুলমণির গ্রামে।

কিন্তু বৃদ্ধের কী অদম্য উৎসাহ।

তিনি বললেন, ট্রেনে বসে বসে এসেছি, পরিশ্রম তো কিছু হয়নি। বিশ্রামের কী দরকার? চলুন, বিকেলেই দেখা করি আমাদের শিল্পীর সঙ্গে।

আজ ছুটির দিন নয়, ফুলমণি কাজে এসে থাকতে পারে। তার গ্রামে যাবার বদলে আগে একবার কনস্ট্রাকশন সাইটটা দেখা দরকার। অনেকটা হেঁটে যেতে হবে।

সিরাজুল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে আমার সাইকেলে যদি ক্যারি করি, আপত্তি আছে?

উনি হেসে বললেন, আপত্তি কীসের। গেলেই তো হল।

এত বড় একজন শিল্পীকে আমি আমার সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এটা যেন ভাবাই যায় না। শিল্পীরাও কত সাধারণ মানুষ হয়ে যেতে পারেন!

সিরাজুল সাহেবের এক-একখানা ছবির দাম পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা। ঘরে বসে নিজের ছবি আঁকার বদলে ইনি এত দূর ছুটে এসেছেন এক অজ্ঞাত কুলশীল শিল্পীকে প্রমোট করার জন্য। একেই বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান!

আমাদের লেবরেটরি বাড়িটার গেটের সামনে নামলুম সাইকেল থেকে। পড়ন্ত বিকেলের আলো হলুদ হয়ে এসেছে। দূরের পাহাড়ের চূড়ার কাছে মুকুট হয়ে আছে সূর্য। একঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে সে-দিকে।

বাড়িটার বাইরের দেয়ালে বাঁশের ভারা বাঁধা। সেই ভারা বেয়ে মাথায় ইটের বোঝা নিয়ে উঠছে এক রোগা নারী। রোদ ঝলসাচ্ছে তার পিঠে।

সেই দিকে আঙুল তুলে বললাম, ওই দেখুন আমাদের শিল্পী।

সিরাজুল সাহেব অপলক ভাবে তাকিয়ে রইলেন সে-দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, কবে আমরা আমাদের দেশের মা-বোনেদের এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারব? মেয়েদের কি আমরা অন্য কাজ দিতে পারি না?

আমি বললাম, সিরাজুল সাহেব, মফস্বল শহরে মেথরানি মেয়েরা মাথায় করে গুয়ের পাত্র বয়ে নিয়ে যায়, দেখেননি? এর চেয়ে হীন কাজ কি আর কিছু আছে? কে জানে, সেই মেথরানিদের কেউ ছবি আঁকতে পারে কি না। কিংবা হয়তো আশা ভোঁসলের মতো গানের গলা আছে।

সিরাজুল সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, আমার মেয়ে, আমিনা, তার কথা আপনি শুনেছেন নীলুবাবু?

আমি বললাম, না।

দূরের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, সে ছিল আমার চোখের মণি, সে একদিন...যাক, আর একদিন বলব।

সিরাজুল সাহেব হঠাৎ বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ভেতরে এনে আমার ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে তাকে বসালাম।]

হেড মিস্তিরি ইরফান আলি এসে আমাকে বলল, সাহেব, আমাদের পেমেন্ট এনেছেন না মহিমবাবু দেবেন?

এখানকার প্রত্যেক মজুরদের আলাদা ভাবে প্রতি দিন টাকা দিয়ে একসঙ্গে থোক টাকা দেওয়া হয় ইরফান আলিকে। সে অন্যদের কাজ অনুযায়ী মজুরি দেয়। এরকমই প্রথা। আমার ছুটি, মহিমবাবুই টাকা আনবেন।

সেকথা বলতে ইরফান আলি খানিকটা অপ্রসন্ন ভাবে ঘড়ি দেখে বলল, উনি কখন আসবেন, ছুটির সময় হয়ে এল।

আমি বললাম, আপনি সাইকেল নিয়ে মহিমবাবুর কাছে চলে যান না।

এরপর আমি ফুলমণিকে ডাকিয়ে আনলাম এ-ঘরে।

একটা মলিন ছাপা শাড়ি পরে আছে ফুলমণি। সেটা অটুটও নয়। লাল ধুলো লেগে আছে এখানে ওখানে। মুখখানা ঘামে মাখা।

আমি বললাম, ফুলমণি, ইনি হচ্ছেন সিরাজুল তারিক সাহেব। খুব বড় শিল্পী। এঁর আঁকা ছবি দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় দেখানো হয়। তোমার ছবিগুলো এঁর ভাল লেগেছে। তাই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

অন্য দিন ফুলমণি যাকে বলে সাত চড়ে রা কাড়ে না, আজ এক জন শিল্পীর কথা শুনে তার প্রতিক্রিয়া হল।

সে মাটিতে বসে পড়ে সিরাজুল সাহেবের দুটি পায়ের পাতা স্পর্শ করল। সিরাজুল সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে, না না, ওঠো মা। ওঠো।

হাত ধরে তিনি ফুলমণিকে তুলতে তুলতে বললেন, ইস, এত রোগা কেন? গায়ের জোর না থাকলে ছবি আঁকবে কী করে? মাথায় অতগুলো ইট নিয়ে ওঠো, যদি পা পিছলে পড়ে যাও? ভাবলেই ভয় করে।

আমার মনে হল, আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেল এখানেই। ফুলমণিকে আমি সঁপে দিলাম সিরাজুল সাহেবের হাতে। এবার থেকে উনিই যা কিছু করার করবেন।

পরদিন ভোরে অবশ্য সিরাজুল সাহেবকে ফুলমণিদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে হল আমাকেই। আমি মহিমবাবুকে বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সিরাজুল সাহেব হেঁটেই যেতে চান। পায়ে হেঁটে নদী পেরুলেন।

এর মধ্যে ফুলমণি সম্পর্কে খানিকটা খোঁজখবর পাওয়া গেছে।

ফুলমণির স্বামী মারা গেছে দু'বছর আগে। এর মধ্যে ওর আবার বিয়ে হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল, ওদের সমাজে এ-রকমই হয়। কিন্তু ফুলমণি বিয়ে না করে রয়ে গেছে শ্বশুরের কাছে। ওর শ্বশুর বৃদ্ধ ও পঙ্গু, তাকে দেখবার আর কেউ নেই। একটা চোদ্দ বছরের ভাতুয়া ছেলেকে ওরা বাড়িতে রেখেছে, ফুলমণি যখন কাজে যায়, তখন সেই ছেলেটি ওর শ্বশুরের দেখাশুনো করে। এই শ্বশুর ফুলমণির ছবি আঁকার গুরুও বটে।

প্রথম দেখে বৃদ্ধকে আমার স্বার্থপর ধরনের মনে হয়েছিল। অবশ্য অসহায়ও বটে। অসহায় ও দুর্বলেরা বেশি স্বার্থপর হয়ে ওঠে।

এবার আমরা যাবার পর গ্রামের অনেক লোক ভিড় করে দেখতে এল। ফুলমণি সম্পর্কে বাবুশ্রেণীর লোকেরা এত আগ্রহ দেখানোতে ফুলমণি এখানে বেশ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ফুলমণি ছবি আঁকে তা এরা জানে, কিন্তু সেই ছবি নিয়ে বাবুদের এত মাথাব্যথা কেন তা তারা বুঝতে পারে না। অনেকেই বাড়ির দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকে, বৃষ্টির জলে তা এক সময় ধুয়ে যায়। ছবির আবার এর চেয়ে বেশি মূল্য আছে নাকি?

আমি এলেবেলে হলেও সিরাজুল সাহেবের চেহারা দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। তিনি একটা ছেঁড়া জামা পরে থাকলেও বোঝা যাবে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাছাড়া, আমি ছোটপাহাড়িতে চাকরি করি, আমার পক্ষে এ গ্রামে আসাটা খুব একটা আশ্চর্যের কিছুনা, কিন্তু সিরাজুল সাহেবের মতো এক সম্ভ্রান্ত মানুষ কলকাতা থেকে এসে ফুলমণির সঙ্গে দেখা করতে, এর মর্ম এখানকার মানুষ বুঝতে পারে না। অনেকগুলো কৌতূহলী, উৎসুক মুখ ঘিরে রইল আমাদের।

সিরাজুল খুব সহজেই ফুলমণির জড়তা কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি ফুলমণির অন্য ছবি দেখতে দেখতে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। ফুলমণি কীভাবে ছবি আঁকে, তা-ও সে ঘরের বারান্দায় বসে তখনই এঁকে দেখাল।

বৃদ্ধটি এতসব ব্যাপারে তেমন খুশি নয়। সে চায় তার ছবি সম্পর্কে কথা বলতে। তাকে বাদ দিয়ে তার পুত্রবধুর অসমাপ্ত ছবিগুলো নিয়ে এত মাতামাতি করা হচ্ছে কেন?

আমাকে একটা কায়দা করতে হল। চন্দনদা আমাকে আলাদা ভাবে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলেছিল, ফুলমণি যদি কলকাতায় আসতে রাজি হয়, তাহলে ওর শ্বশুরকে এই টাকাটা দিয়ে আসবি কয়েক দিনের সংসার খরচের জন্য।

আমি বৃদ্ধকে বললাম, আপনার ছবিগুলো কলকাতায় অনেকের খুব ভাল লেগেছে। সবাই জিজ্ঞেস করছিল আপনার কথা।

বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, ভাল লেগেছে? ভাল লেগেছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনার সব ছবি বিক্রি হয়ে গেছে। চারশো টাকায়। এই নিন সেই টাকা। একশো টাকা আমি সরিয়ে রাখলাম, ওটা ফুলমণিকে হাতখরচ হিসেবে দিতে হবে। ফুলমণি যদি দিন সাতেকও বাইরে থাকে, তার মধ্যে এই বৃদ্ধের জন্য চারশো টাকাই যথেষ্ট।

বৃদ্ধ শিশুর মতো খুশি হয়ে বার বার বলতে লাগলেন, আমার ছবি... শহরের মানুষ দাম দিয়ে কিনেছে? আমি আরও ছবি আঁকব!

কিন্তু ফুলমণিকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব শুনে বৃদ্ধের সেই খুশি অন্তর্হিত হয়ে গেল।

একটুক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসে থাকার পর বললেন, না না, ও কী করে একা একা কলকাতায় যাবে? আমার তবিয়ৎ ঠিক থাকলে আমি যেতাম। ও যাবে না!

পেছনের দর্শকদের মধ্যে থেকে এক ছোকরা বলল, ফুলমণি কি গান গাইবে না নাচবে? ছবি দেখাবার জন্য ওকে যেতে হবে কেন? শুধু ছবিগুলো নিয়ে গেলেই হয়!

আরও কয়েক জন হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, ফুলমণি গান গাইবে না, নাচবে? মুখচোরা, হারজিড়জিড়ে ফুলমণির গান গাওয়া কিংবা মঞ্চের ওপর নাচের দৃশ্যটা এমনই অবিশ্বাস্য যে অনেকেই হাসি পায়।

ফুলমণির শ্বশুর জনসমর্থন পেয়ে উৎসাহিত হয়ে বললেন, ও চলে গেলে আমাকে দেখবে কে? আমি একা এই খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে মরব?

বাসন্তী এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। ফুলমণির প্রতি তার সহানুভূতি হয়েছে সম্প্রতি। সম্ভবত ছবি এঁকে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা তাকে আকৃষ্ট করেছে।

বাসন্তী বলল, যাক না ফুলমণি। আবার তো ঘুরে আসবে। এই কদিন আমি তোমাকে দেখব।

এরপর ফুলমণির যাওয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা রকম কথা শুরু হয়ে গেল। আমি বসে রইলাম চুপ করে।

খানিক বাদে ফুলমণির শ্বশুর সিরাজুল তারিককে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই বলুন না, আপনি বুঝার মানুষ, ফুলমণির কলকাতায় যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে?

সিরাজুল সাহেব শান্তভাবে বললেন, আছে। গেলে ভাল হয়। ছবির প্রদর্শনী হলে অনেকে শিল্পীকে দেখতে চায়। ফুলমণিরও উপকার হবে, জানাশুনা হবে, অনেক লোকের সঙ্গেই, ও আরও অনেক ছবি দেখবে, শিখতে পারবে।

বৃদ্ধ বললেন, কলকাত্তা বড় খিটকেল জায়গা। আমি তো জানি।

সিরাজুল সাহেব বললেন, ফুলমণিকেই জিজ্ঞেস করা যাক না, ও যেতে চায় কি না। না চাইলে জোর করে তো কেউ নেবেনা।

উঠোনে ফুলমণির শ্বশুরের খাটিয়া ঘিরে কথা হচ্ছে আমাদের। ফুলমণি বসে আছে ঘরের দাওয়ায়। সে ছবিগুলো সব গুছিয়ে রাখছে।

সবাই এবার সে দিকে তাকাল। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, তুই যাবি?

ফুলমণি মাথা তুলল, নিচু গলায়, কিন্তু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, যাব!

শুনেই মনে হল সে অনেকক্ষণ আগেই মন ঠিক করে রেখেছে। অন্যদের মতামতের কোনও মূল্য নেই তার কাছে। ওই একটা শব্দ শুনেই ফুলমণির ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। মেয়েটা যতই লাজুক হোক, এই ছোট গণ্ডির বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তার আকর্ষণ আছে, ছবির প্রদর্শনীতে সে উপস্থিত থাকতে চায়, তার মানে প্রকৃত শিল্পী হবার বীজ রয়েছে ওর মধ্যে।

বৃদ্ধ এবার আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা তোওকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ও ফিরবেকী করে? কোনওদিন একলা কোথাও যায়নি, লোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমার সঙ্গে ফিরবে। আমি তো কলকাতায় থাকি না, এখানে চাকরি করি, দু'চারদিনের মধ্যেই আমাকে ফিরতে হবে।

এরপর আর আপত্তির কারণ রইল না। কিন্তু বাধা এল অন্য দিক থেকে।

সন্ধেবেলা গেস্ট হাউসে এসে উপস্থিত হলেন মহিম সরকার। চোখ সরু করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মি. নীললোহিত, আপনি নাকি একটা কামিনকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। কামিন মানে ওই ফুলমণি, যে খুব ভাল ছবি আঁকে।

মহিমবাবু বললেন, ছবি-ফবি আমি বুঝি না। আমি বুঝি কোম্পানির কাজ। এখানকার একটা ওয়ার্কার মেয়েকে আপনারা কাজ নষ্ট করে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে? অন্য ওয়ার্কাররা কী ভাববে?

তারা কী ভাববে আমি কি করে জানব বলুন তো?

তারা চটে যাবেনা? একজনকে, একটা মেয়েকে বেশি বেশি খাতির করা হচ্ছে, এটা তারা সহ্য করবে কেন! আপনি এ কাজটা ভাল করছেন না।

আমি তো নিজের দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি না মহিমবাবু। আমাকে চন্দনদা, আই মিন, মি. চন্দন ঘোষাল বলেছেন, এটা তারই নির্দেশ।

মি, ঘোষালের পার্সোনাল ব্যাপার হলে আমি কিছু বলতে চাইনা। কিন্তু কোম্পানির কাজ হ্যামপার হলে –

এটাও কোম্পানির কাজের মধ্যে পড়ে। কোম্পানি ঠিক করেছে, এখানে শুধু বাড়ি আর কারখানা বানালেই চলবে না। স্থানীয় লোকদের উন্নতির দিকটাও দেখতে হবে। অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক দুটো দিকই।

সেই ছুঁতোয় একটা ইয়াং মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া।

দেখুন মহিমবাবু, ফুলমণি ইয়াং ঠিকই এবং মেয়েও বটে। কিন্তু আপনি যে সেনসে বলছেন, সেটা এখানে খাটে না। ছবি আঁকতে পারাটাও ওর একমাত্র যোগ্যতা। এখানকার একটি মেয়ে যদি শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে এই জায়গাটারও তো সুনাম হবে।

আপনি ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি সদ্য কাজে যোগ দিয়েছেন, এরমধ্যেই ছুটি নিয়েছেন দু'দিন, আবার কলকাতায় চলে যাচ্ছেন।

আবার ছুটি নেব। চাকরিতে ক্যাজুয়াল লিভ, আর্নড লিভ এসব পাওয়া যায় না?

আপনি কি পার্মানেন্ট স্টাফ যে ছুটি পাবেন? আপনার চাকরির মোট তিন সপ্তাহও হয়নি, হে হে হে, এর মধ্যে ছুটি।

দেখুন আমাকে চাকরিটা দিয়েছেন মি.চন্দন ঘোষাল। তিনিই আমার বস, তাইনা? তিনি যে কাজ দেবেন, আমাকে সেই কাজই করতে হবে।

সে আপনি যাই-ই বলুন মশাই, ব্যাপারটা ভাল হচ্ছেনা। ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন চলছে, এখানকার কোনও মেয়েকে বাইরে নিয়ে চলে যাওয়া এরা মোটেই ভাল চোখে দেখবে না, এই আমি বলে যাচ্ছি।

মহিম সরকার আমাকে মোটামুটি শাসানি দিয়েই চলে গেলেন।

চন্দনদা এসে পৌঁছল রাত্তিরের দিকে। মহিম সরকারের আপত্তির কথাটা জানাতে চন্দনদা পাত্তাই দিল না। বাঁ-হাতে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বলল, দুর দুর, ও লোকটা একটা মাথা-মোটা। একটা সাঁওতাল মেয়ের আঁকা ছবি অন্য সব শিল্পীর সঙ্গে সমান মর্যাদায় একটা বড় প্রদর্শনীতে স্থান পাচ্ছে, এরকম আগে কখনও ঘটেছে? বিরাট ব্যাপার। এক জন গুণীর মর্যাদা দেওয়াটা কখনও অপরাধ হতে পারে? ঝাড়খণ্ডী নেতারা এটা ঠিক বুঝবে। ওদের সঙ্গে আমার ভাব আছে।

পরদিন সকালেই রওনা হলাম আমরা। বাসে যেতে হবে না, চন্দনদার জিপ আমাদের বেল স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। ফুলমণির ছবিগুলো ভালভাবে প্যাক করে নিয়েছেন সিরাজুল সাহেব। একটা পুঁটলিতে ভরে নিয়ে এসেছে ফুলমণি তার অন্য জিনিসপত্র। পায়ে রবারের চটি, পরনে একটা নীল পাড় সাদা শাড়ি।

গেস্ট হাউসের সামনে আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে কয়েক জন। বাসন্তী আর ওদের গ্রামের কয়েকটি ছেলে। এবং মহিম সরকার। তিনি এখন দিব্যি হেসে হেসে গল্প করছেন চন্দনদার সঙ্গে। হঠাৎ এক সময় কাছে এসে ফুলমণির দিকে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে তিনি বললেন, ফুলমণি, তোর কিন্তু ফার্স্ট হওয়া চাই। তুই প্রাইজ নিয়ে ফিরে এলে আমি সবাইকে মিষ্টি খাওয়াব।

জিপে ওঠার আগে ফুলমণি একবার দূরের মাঠের দিকে ঘুরে তাকাল। আজকে আকাশ সজল মেঘে ঢাকা। পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে না। ডান পাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে কয়েকটা মোষকে তাড়িয়ে নিয়ে এল একটা বাচ্চা রাখাল। একটা কুকুর অকারণে সেখানে চ্যাঁচাচ্ছে, উড়ে গেল একঝাক কোচ বক।

ফুলমণি যেন তার ছবির পটভূমিকাগুলি একবার দেখে নিল চোখ ভরে।

৭-৮. প্রদর্শনী উদ্বোধন

প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এলেন লেডি রাণু মুখার্জি।

এত দিন তাকে শুধু ছবিতেই দেখেছি। অসাধারণ রূপসী ছিলেন, এখন প্রচুর বয়স হয়ে গেলেও সেই রূপের আভা যায়নি। একা একা আর চলা-ফেরা করতে পারেন না, সব সময় তার সঙ্গে এক জন সেবিকা থাকে, তবু নাকি তিনি আজও প্রত্যেকটি ছবির প্রদর্শনীতে আসেন। শিল্পের প্রতি এই ভালবাসা তাঁর বর্ণময় জীবনকে একটা আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

শিল্প জগতের এই প্রবাদ-প্রতিমাকে অমি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম দূর থেকে।

সিরাজুল সাহেব এই প্রদর্শনীর শিল্পীদের সঙ্গে লেডি রাণুর আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের তিনখানা ঘর জুড়ে চলছে এই প্রদর্শনী। মোট সতেরো জন শিল্পী, সকলেই যে বয়সে নবীন তা নয়। কেউ কেউ এসেছে বারাসত, বনগাঁ, ঝাড়গ্রাম, দুর্গাপুর থেকে। তবে কলকাতার ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাই খুব বেশি। সতেরো জনের মধ্যে এক জন শুধু অসুস্থ বলে আসতে পারেনি।

অন্য শিল্পীদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল ফুলমণিকে। আজও পায়ে সেইরবারের চটি, নীল পাড় সাদা শাড়ি, বিশেষত্বের এই যে, আজ তার মাথার চুল ভালভাবে আঁচড়ানো, তাতে একগুচ্ছ সাদা ফুল গোঁজা।

ছোটপাহাড়ি থেকে এনে ফুলমণিকে আর কোথায় তুলব, চন্দনদার কথা মতো নিয়ে গিয়েছিলাম নীপাবউদির কাছে। নীপাবউদি বেশ আগ্রহ করেই ফুলমণিকে স্থান দিয়েছে। আজকাল সব মহিলার মধ্যেই একটু একটু উইমেন্স লিব-এর ছোঁয়া আছে, তাই এক জন নারী হয়ে অন্য একটি নারীকে সাহায্য করতে নীপাবউদির কোনও কার্পণ্য নেই।

মুশকিল হয়েছিল লালুদাকে নিয়ে। এই সবর্ঘটে কাঁঠালি কলাটি যথারীতি সে-বাড়িতে উপস্থিত। ফুলমণি সম্পর্কে নীপাবউদির উৎসাহ দেখে লালুদার উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। ফুলমণি দুখানা মাত্র নীল-পাড় শাড়ি ছাড়া আর কিছুই আনেনি শুনে লালুদা লাফিয়ে উঠে বলল, সে কী, অত বড় আর্ট একজিবিশানে যাবে, লেডি রাণু আসবেন, সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠানো দরকার। তাহলে ওর জন্য এক জোড়া বেনারসি কিনে আনি?

নীপাবউদি বলল, বেনারসি? কেন, ও কি বিয়ে করতে যাচ্ছে নাকি?

লালুদা বলল, তাহলে সিল্ক টাঙ্গাইল।

নীপা বউদি বলল, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি! ও অত সেজেগুজে যাবে কেন? ওর যা স্বাভাবিক পোশাক, তা পরেই যাবে। তাতেই ওর আত্মসম্মান বাড়বে।

তাহলে এক সেট রুপোর গয়না কিনে আনা যাক। ওরা রুপোর গয়না খুব পরে আমি দেখেছি।

কোনও দরকার নেই। বেশি সাজগোজ করে ও যাবে কেন?

আহা, বুঝছ না নীপা। লোকের চোখে পড়া দরকার, বুঝলে না, আজকাল পাবলিসিটির যুগ।

ছবি ভাল লাগলেই লোকে ওকে চিনবে।

তাহলে অন্তত কয়েকটা ভাল সাবান।

নীপাবউদির ধমক খেয়ে লালুদা শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হল বটে, কিন্তু কোনও অছিলাতেই টাকা খরচ করার সুযোগ না পেয়ে মর্মাহত হল খুব।

নীপাবউদি যে ফুলমণির পোশাক নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি করেনি, তাতে আমিও খুশি হয়েছি। এক সাঁওতাল গ্রামের মেয়ে কেন কলকাতার মেয়েদের মতো সাজতে যাবে। ওর নিজের পোশাকই তো ওর অহঙ্কার। ও যেমন, ঠিক তেমনই ওকে মানাবে।

এখন যে ফুলমণি অন্য শিল্পীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে ওকে একটুও বেমানান লাগছেনা। পোশাকনয়, আসল তো মুখ। নিরক্ষর, গ্রাম্য মেয়ে হলেও ফুলমণি বোকা নয়। শিল্পীসুলভ একটা প্রত্যয়ের ছাপ আছে ওর মুখে। এখানকার অন্য ছবিগুলো দেখে ও নিশ্চয়ই বুঝেছে যে, ও নিজেও অন্যদের চেয়ে কম কিছু নয়।

সতেরো জনের মধ্যে ফুলমণি ছাড়াও আরও পাঁচটি মেয়ে আছে, তারাও কেউ উগ্র সাজগোজ করেনি। সহজ-অনাড়ম্বর পোশাক। ফ্যাশানেবল মহিলারা সচরাচর ভাল শিল্পী হয় না।

সিরাজুল তারিক অন্য শিল্পীদের সঙ্গে লেডি রাণুর পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে ফুলমণির কাছে এসে বললেন, এই মেয়েটি, জানেন, কোথাও শেখেনি, একটা রিমোট গ্রামে থাকে, কিন্তু অসাধারণ ছবি এঁকেছে।

লেডি রাণু বললেন, তাই নাকি? তাহলে তো ওর ছবিই আগে দেখতে হয়।

প্রত্যেকেরই চারখানা করে ছবি টাঙানো হয়েছে। ফুলমণির ছবিগুলোর কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে লেডি রাণু বলতে লাগলেন, বাঃ বেশ তো। সত্যি ভাল।

তারপর ফুলমণিকে জিজ্ঞেস করলেন, অনেক রকম লাইন দেখছি, তুমি কতগুলো তুলি ব্যবহার করো?

সিরাজুল সাহেব বললেন, ও তো তুলি দিয়ে আঁকেনা।

ফুলমণি তার একটা হাত তুলে পাঞ্জাটা মেলে ধরল।

সিরাজুল সাহেব বললেন, ও শুধু আঙুলের ডগা আর নখ দিয়ে আঁকে। আমি নিজে দেখেছি আঁকতে। ফ্যানটাস্টিক!

লেডি রাণু খুবই অবাক হলেন। আরও অনেক প্রশংসা করে চলে গেলেন অন্য ছবির দিকে।

লোক কম হয়নি। প্রেস, চিত্র সমালোচক, ফটোগ্রাফার, শিল্পীদের আত্মীয়-স্বজন এবং কিছু দর্শক। নীপাবউদিরা আজ আসতে পারেনি, কাল আসবে বলেছে।

ফুলমণির ছবিগুলোর কাছে কিছু দর্শক দেখলেই আমি তাদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই, তাদের মন্তব্য শোনার চেষ্টা করি। সবাই যে একবাক্যে প্রশংসা করছে তা নয়। কেউ কেউ শুধু চোখ বুলিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ খুঁটিয়ে দেখছে। কেউ বলছে, বাঃ, মন্দ নয়।

দুজন নামকরা সমালোচক সিরাজুল সাহেবের কাছে যেচে প্রশংসা করে গেলেন। আলাপ করলেন ফুলমণির সঙ্গে। ফুলমণি একটা-দুটো প্রশ্নের উত্তরও দিল। ওঁদের মধ্যে এক জন শুধু প্রশংসাই করে গেলেন, আর এক জন রঙের ব্যবহার নিয়ে কয়েকটি পরামর্শ দিলেন ফুলমণিকে। দুজনের ব্যবহারই বেশ আন্তরিক। চন্দনদা সমালোচকদের সম্পর্কে বড় কঠিন মন্তব্য করেছিল। এই তো এঁরা নিজে থেকেই এসেছেন। এখানে মদের ফোয়ারা নেই, খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা নেই, শুধু চা আর দুটো করে সিঙাড়া।

কিছু কিছু খ্যাতিমান শিল্পীরা আসছেন, কয়েকজনকে চেনা যায়। এরা তরুণদের কাজ সম্পর্কে কৌতূহলী, এক-এক জনকে ঘিরে ছোটখাটো দল হয়ে যাচ্ছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের সদলবলে চলাই রীতি। আমি লক্ষ্য করলাম, এরা প্রায় সকলেই ছবিগুলোর দিকে ওপর ওপর চোখ বুলোলেন শুধু, তারপর ভক্তদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। এদের পাকা চোখ, এক ঝলক দেখেই বুঝে নেন। কোনও কোনও তরুণ শিল্পী তার গুরুস্থানীয়কে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজের ছবিগুলোর কাছে। এক-এক জন শিল্পী এতই ভদ্র এবং উদার যে, সবাইকে বিলিয়ে যাচ্ছেন প্রশংসা।

সিরাজুল তারিক সাহেব চলে গেলেন একটু আগে।

আমার ওপর নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ফুলমণিকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত থেকে যেতে। আটটার সময় বন্ধ হবে। থাকতে আমার খারাপ লাগবে না। এতগুলি শিল্পীর এত রকমের ছবি, এত দিনের নিষ্ঠা, ভাবনা, রঙের পরীক্ষা, সব মিলিয়ে পরিবেশটা একেবারে অন্যরকম। যেন একটা চমৎকার উদ্যান।

কোনও বিখ্যাত শিল্পীকে ফুলমণি তার নিজের ছবির কাছে নিয়ে যাবে, সে-প্রশ্নই ওঠে না। সে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। আমিও কারুকে অনুরোধ করতে পারছি না, কেউ যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনার এত উৎসাহ কেন মশাই? ওই মেয়েটা আপনার কে হয়?

আমি দূর থেকে অন্যদের প্রতিক্রিয়া দেখছি। কেউ কেউ ফুলমণির ছবির সামনে থামছে, কেউ থামছে না। তবে একটা ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এ-পর্যন্ত এক জনও কেউ বলেনি যে, এ আদিবাসী মেয়েটির আঁকা ছবি নিম্নমানের, এই প্রদর্শনীর উপযুক্ত নয়। ফুলমণির ছবি দয়া করে রাখা হয়নি, কিংবা চন্দনদা, সিরাজুল সাহেবের হুজুগে পক্ষপাতিত্ব নয়। অন্য শিল্পীদের সমান যোগ্যতা তার আছে।

আমাদের দেশে প্রদর্শনীর মাঝখানে ছবি কেউ কিনতে চাইলে 'সোল্ড' লিখে দেওয়া হয় না, শুধু একটা লাল টিপ দেওয়া হয়। ফুলমণির ছবি কেউ কেনে কিনা সে সম্পর্কে আমার দারুণ কৌতূহল। সিরাজুল সাহেব অবশ্য বলেছিলেন, আমাদের দেশে সাধারণ বাঙালি দর্শকরা তো ছবি কেনে না, তাদের ভরসা নেই। ছবি কেনে গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া, বিড়লা, রুশি, মোদিরা। তারা নতুনদের প্রদর্শনীতে চট করে আসে না, তাদের প্রতিনিধিদের ধরে আনতে হবে।

তবে এরই মধ্যে একটিমাত্র ছবিতে লাল টিপ পড়েছে। কৌশিক শূর নামে একজনের আধাবিমূর্ত ছবি। কৌশিক শূরের বয়স বড় জোর সাতাশ, মুখভর্তি দাড়ি, চোখ দুটি স্বপ্নময়।

সাড়ে সাতটার সময় এলেন বিশ্বদেব রায়চৌধুরী, এঁর খ্যাতি ভারতজোড়া। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, সদা হাস্যময়মুখ। তার কোনও এক ভাবশিষ্যের ছবি আছে এখানে, খুব সম্ভবত সেই জন্যই তিনি এসেছেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি ফুলমণির দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন।

অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে মাথায় ফুল গোঁজা একটি সাঁওতাল মেয়েকে তো আর প্রতি দিন দেখা যায় না। কোনও চাষি, জেলে, মজুর, তাঁতি কোনও দিন এখানে আসেনা। এসব ছবি তাদের জন্য নয়। শিল্প-সাহিত্য গোটা ব্যাপারটা থেকেই আমাদের দেশের শতকরা আশি জন বাদ।

বিশ্বদেব রায়চৌধুরীর বিস্ময় স্বাভাবিক।

কয়েক জন তরুণ শিল্পী ফুলমণিকে ওঁর কাছে নিয়ে গেল। আমি দূর থেকে দেখলাম, উনি ফুলমণির সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে দু'চারটে কথা বললেন, ফুলমণির ছবিও দেখলেন।

তারপর তিনি অন্য দিকে মন দিতে আমি ফুলমণিকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ওঁকে চিনতে পেরেছ? বিরাট শিল্পী। উনি কী বললেন তোমাকে?

ফুলমণি সরু করে হেসে, দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, উনার ভাল লাগে নাই।

কথাটা আমার বিশ্বাস হল না। বিশ্বদেব রায়চৌধুরীর যেধরনের মানুষ, খারাপ লাগলেও তো সেকথা মুখে বলবেন না। তিনি এখন এত উঁচুতে উঠে গেছেন যে কারুকেই আর ছোট করার দরকার হয় না ওঁর।

পাশ থেকে আর একটি মেয়ে বলল, না না, উনি ছবিগুলোকে খারাপ বলেননি। প্রশংসাই করেছেন। শুধু বললেন, যে কাগজে আঁকা হয়েছে, তাতে রঙ বেশি দিন থাকবে না। ভাল কাগজে কিংবা ক্যানভাস ব্যবহার করা উচিত।

আমি ভাবলাম, ভাল কাগজ কিংবা ক্যানভাস কেনার পয়সা ও পাবে কোথায়? সিরাজুল সাহেব ঝোঁকের মাথায় বলেছিলেন, ফুলমণির ছবির প্রত্যেকটির দাম পাঁচ হাজার টাকা। এখানে ছবির মেটেরিয়াল অনুযায়ী দাম ধরা হয়েছে। ফুলমণির একটা ছবির দাম সাতশো, অন্যগুলো একহাজার, দেড় হাজার, দু'হাজার। বিক্রি হয় কি না সেইটাই পরীক্ষা। ধরা যাক সব কটাই বিক্রি হয়ে গেল। তারপর ফুলমণি কী করবে? ওই ক'টা টাকায় ওর কত দিন চলবে? ওর শ্বশুর বেশ কিছু নিয়ে নেবে, পাড়া-প্রতিবেশীরাও ভাগ বসাবে। বড় ভোজ হবে। ফুলমণি কি আবার ইট বওয়ার কাজে ফিরে যাবে?

অন্য আর পাঁচ জন শিল্পীর মতো ফুলমণি শুধু ছবি আঁকার সাধনা করে যাবে, এর কি কোনও উপায় নেই?

চন্দনদার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

সিগারেট টানার জন্য বাইরে এলাম, ফুলমণিও এল আমার সঙ্গে। অ্যাকাডেমির সামনের প্রাঙ্গণে সবসময়েই ভিড় থাকে, এখন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। বিদ্যুতের চমক বৃষ্টির খবর দিল। অনেকগুলো ফুলের গন্ধ আসছে এক সঙ্গে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি, কেমন লাগছে এখানে?

ফুলমণি হাসল। কথা তো বলেই না প্রায়, ওই হাসিটুকুও যথেষ্ট।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়, তুমি কলকাতায় থেকে যেতে পারবে? এখানে ইচ্ছে মতো ছবি আঁকবে।

আমার চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে ফুলমণি বলল, কী জানি!

আর কিছু বলার আগেই ভেতরে একটা গোলমাল শুনতে পেলাম। কে যেন রেগেমেগে চিৎকার করছে।

আর্ট একজিবিশানে সবাই মৃদু স্বরে কথা বলে। এখানে চিৎকার অস্বাভাবিক। ছুটে গেলাম হলের মধ্যে।

এখন দর্শক আর নেই বলতে গেলে সবাই প্রায় শিল্পী বা তাদের বন্ধুবান্ধব। বিশ্বদেব রায়চৌধুরী দূরের এক কোণে ছবি দেখছেন, আর ফুলমণির ছবির সামনে এক জন মজবুত, দীর্ঘকায়, ইগল-নাসা পুরুষ, অনিন্দ্য দাস! হাতের বেতেরছড়ি।

ছড়িটা তুলে বললেন, কোথায় চন্দন ঘোষাল কোথায়? ডাক সেই শালাকে। আদিবাসী মেয়ের আঁকা ছবি? কোন কালচার? এথনিক? আমার সঙ্গে ফেরেববাজি। চন্দন ঘোষালকে আমি চিনি না? আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। ছবি আঁকার খুব শখ ছিল। ছবির হ্রস্বি-দীর্ঘি জ্ঞান নেই, তবু আঁকবে। এই সব এঁকেছে, নিজের নামে ছবি ঝোলাবার মুরোদ নেই, এখন সাঁওতাল মেয়ের নামে চালাচ্ছে!

আমাকে দেখতে পেয়ে গলা চড়িয়ে অনিন্দ্য দাস জিজ্ঞেস করলেন, অ্যাই যে, এই ছেলে ই-দিকে আয়। চন্দন কোথায়?

আমি বললাম, তিনি আসেননি।

পালিয়ে থাকছে! সাহস নেই। ওর কি এত পয়সার খাঁকতি হয়েছে যে ছবির বাজারে ঢুকতে চায়? আদিবাসী আর্ট, শালা। মধুবনী পেইন্টিং এখন বালিগঞ্জে তৈরি হয়, আমি জানি না? কালিঘাটের পটের ভেজাল, আর্ট কলেজের ছাত্ররা এঁকে সাপ্লাই দিচ্ছে! চন্দন আসেনি কেন? তোরা যে বলছিলি... কোথায় সেই মাগিটা কোথায়? মাগিটাকে শো কর, দেখি সে কেমন আঁকে।

আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। অনিন্দ্য দাস যত বড় শিল্পীই হোক না কেন, আমি তার ধমক খেতে যাব কোন দুঃখে?

আমি বললাম, আপনাকে আমি প্রমাণ দিতে যাব কেন? আপনার ইচ্ছে না হয় বিশ্বাস করবেন না! হাতের ছড়িটা আমার কাঁধে ঠেকিয়ে অনিন্দ্য দাস বললেন, আলবাত প্রমাণ দিতে হবে। আর্টের বাজারে জোচ্চুরি আমরা সহ্য করবনা। ফলস নামে ছবি বেচা, আমাদের সকলের বদনাম হবে।

বিশ্বদেব রায়চৌধুরী কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহ ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, কী হল অনিন্দ্য, এত রাগারাগি করছ কেন?

অনিন্দ্য দাস বললেন, আপনি চুপ করুন তো। আপনি কিছু জানেন না, কী সব নখরাবাজি চলছে চারদিকে। আমি মাগিটাকে দেখতে চাই, সে কেমন ছবি আঁকে। এটা কিছু অন্যায় বলিনি।

কথা বলতে বলতে অনিন্দ্য দাস একটুখানি দুলে যেতেই বোঝা গেল, তিনি বেশ খানিকটা মদ্যপান করে এসেছেন। তার মাথায় কোনও যুক্তিবোধ কাজ করছেনা।

বিশ্বদেব রায়চৌধুরী বুঝলেন এখানে আর কথা বলতে গেলে তার মান থাকবে না। তিনি আস্তে আস্তে সরে পড়লেন।

অন্য এক জন কেউ বলল, মেয়েটি তো এখানেই ছিল। বোধহয় বাইরে গেছে।

কোথায়, কোথায়, বলতে বলতে অনিন্দ্য দাস দরজার দিকে এগোলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হল।

ফুলমণি জলের ফোয়ারাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি পড়ছে দু'এক ফোঁটা। ফুলমণিকে দেখে হা-হা শব্দে অট্টহাসি দিয়ে উঠলেন অনিন্দ্য দাস।

তারপর বললেন, এই মেয়ে! একে তো রেল লাইনের ধার থেকে ধরে এনেছে। একটা সাঁওতাল মেয়েকে এনে দাঁড় করালেই হল। ও ওর বাপের জন্মে তুলি ধরতে শিখেছে? আমি বাজি ফেলতে পারি।

ফুলমণির কাছে গিয়ে তিনি আবার বললেন, এই মেয়ে, তুই ছবি আঁকতে পারিস? সত্যি করে বল!

ফুলমণি কোনও উত্তর দিল না, ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফস করে পকেট থেকে একটা তুলি বার করে অনিন্দ্য দাস বললেন, এটা ধর তো! ছবি এঁকে দেখাতে হবে না, শুধু তুলিটা কেমন ভাবে ধরিস, সেটা দেখব।

আমি বললাম, ও তুলি দিয়ে আঁকে না।

তবে কি ইয়ের ইয়ে দিয়ে আঁকে।

ও শুধু আঙ্গুল দিয়ে আঁকে।

আবার একখানা জোর হাসি দিলেন অনিন্দ্য দাস। আমাকে একটা খোঁচা মেরে বললেন, আঙুল দিয়ে...একি বাবা কপালে ফোঁটা কাটা? তোর কপালে মেয়েটা ফোঁটা দিয়েছে নাকি রে?

ফুলমণির একটা হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, দেখি দেখি, আঙুলগুলো দেখি! এ যে সব ঢ্যাঁড়োশ।

ফুলমণি জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

অনিন্দ্য দাস বললেন, ইঃ, তেজ আছে! ক'পয়সা পেয়েছিস? ফুলমণির গালে এক আঙুলের ঠোনা মেরে বললেন, মুখটা ফেরা তো। হুঁ প্রোফাইলটা ইন্টারেস্টিং।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি একটা সাঁওতাল ছেলে। ঝাড়খণ্ডের সমর্থক। আমার গ্রামের একটি মেয়েকে অপমান করছে কলকাতার এক বাবু। আমার রক্ত গরম হয়ে গেল।

আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিন্দ্য দাসের কলার চেপে ধরে বললাম, ছেড়ে দিন ওকে। অসভ্য কোথাকার।

অনিন্দ্য দাস আমাকে মারার জন্য ছড়ি তুললেন।

আর কয়েক জন মাঝখানে এসে পড়ে ঠেলে সরিয়ে দিল দু'জনকে।

কেউ একজন আমাকে টানতে টানতে নিয়ে এল ভেতরে। জোর করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। রাগে তখনও আমি হাঁপাচ্ছি। অনিন্দ্য দাসের কয়েকটা দাঁত ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল।

যে-ছেলেটি আমাকে টেনে এনেছে, সে বলল, চুপ করে একটু বসুন। অনিন্দ্য দাস লোক খারাপ নন। যখন তখন মাথা গরম করেন। কিন্তু গ্রেট সোল। আপনার সঙ্গে যদি ভাব হয় একবার, দেখবেন আপনার জন্য সর্বস্ব দিয়ে দেবেন।

আমি বললাম, আমার দরকার নেই ভাব করার। যে ও-রকম মুখ খারাপ করে।

ওনার মুখটাই ও-রকম, মনটা পরিষ্কার।

ফুলমণিকে ও যদি আবার কিছু বলে?

না, ফুলমণি বাথরুমে গেছে।

পাশ থেকে আর এক জন বলল, অনিন্দ্যদা চলে গেলেন। কী বলতে বলতে গেলেন জানো, এখানকার সবকটা ছবি বোগাস! সব ফলস।

ওই দু'জন খুব হাসতে লাগল।

একজন বলল, কাল দেখবি অনিন্দ্যদা এসে খুব প্রশংসা করবে। আজ পেটে একটু বেশি পড়েছে। কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় এক জন ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন, আপনারা এখানে মারামারি শুরু করেছিলেন? ছি ছি ছি। এখানে কোনও দিন ও-সব হয় না।

আমি আহতভাবে বললাম, আপনি শুধু আমাকে বলছেন? আমি কি শুরু করেছি! অনিন্দ্যবাবু যা-তা বলতে শুরু করলেন।

অনিন্দ্যবাবু এক জন নামকরা আর্টিস্ট। তার মুখে মুখে আপনি কথা বলতে গেলেন কেন? আপনি কে?

আমি ছবি আঁকতে পারি না বটে, কিন্তু আমি এক জন ভদ্রলোক।

সিরাজুল সাহেবকে বলব।

যা খুশি বলবেন। আমি চলে যাচ্ছি, আর আসব না।

আটটা বেজে গেছে। বন্ধ করার সময়ও হয়ে গেছে। চলে এলাম বাইরে। ফুলমণি এখনও বাথরুম থেকে ফেরেনি। এতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিবেশটা সম্পর্কে যে ভাললাগা ছিল, এক জন লোক এসে তা নষ্ট করে দিল। এখানে চন্দনদার উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। অন্তত প্রথম দিনটা। কিন্তু চন্দনদা নিজে সব ব্যবস্থা করে দিলেও সামনে আসতে চাইছে না। নীপাবউদিকে বোঝাতে চায় যে, ফুলমণি সম্পর্কে যাবতীয় উৎসাহ শুধু আমার।

একে একে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে। ফুলমণি এতক্ষণ কী করছে বাথরুমে? সে-দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলাম, কিন্তু মেয়েদের বাথরুমের মধ্যে ঢুকে তো দেখা যায় না।

বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে গজরাচ্ছে আকাশ।

আসল বৃষ্টি শুরু হয়নি, ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বড় বড় ফোঁটা এসে গায়ে লাগছে। এই রকম সময়ে বেড়াতে মজা লাগে। ফুলমণি যদি চায়, এক্ষুনি বাড়ি না ফিরে ময়দানে

খানিকক্ষণ ঘোরা যেতে পারে। কলকাতার ময়দানের একটা দারুণ রূপ আছে, সেটা দেখলে ওর ভাল লাগবে আশা করি। চৌরঙ্গির এক দিকে আলোকোজ্জ্বল বড় বড় বাড়ি, আর এক দিকে অন্ধকার।

আরও একটা সিগারেট শেষ হয়ে গেল, ফুলমণি তবু আসছে না কেন? এবারে বোধহয় গেট-ফেট বন্ধ করে দেবে। না, পেছন দিকের হলের নাটক এখনও ভাঙেনি। বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ফুলমণি অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি?

একটি যুবতী খটখটে জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে আসছে বাথরুম থেকে। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু মনে করবেন না। বাথরুমে কি আর কেউ আছে? আমার একজন আত্মীয় ঢুকেছিলেন।

মেয়েটি সপ্রতিভ ভাবে বলল, না, আর কাউকে দেখলাম না তো।

তারপর সে নিজেই আর একবার উঁকি দিয়ে এসে বলল, না, কেউ নেই। আমি বললাম, কেউ নেই? তাহলে...তাহলে আমি একবার নিজে দেখে আসতে পারি?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, যান না। আমি দাঁড়াচ্ছি।

কপালে আমার এত ছিল, মেয়েদের বাথরুম পরিদর্শন করতে হবে। তা-ও কিনা ফাঁকা। মেয়েদের বাথরুমের দেওয়ালে কিছু লেখা থাকে কিনা, সে-বিষয়ে আমার কৌতূহল ছিল যথেষ্ট, কিন্তু এখন সেসব দেখার সময় নয়।

নিঃসন্দেহে বলা যায় ভেতরে কেউ নেই।

যুবতীটি অপেক্ষা করছে, বলল, পেলেন না?

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম।

কী-রকম দেখতে বলুন তো?

নীল-পাড় সাদা শাড়ি পরা, মাথায় ফুল গোঁজা, রোগা, আপনারই বয়সীহবে বোধহয়।

না, সেরকম কারুকে দেখিনি। দেখুন বোধহয় বাইরে অপেক্ষা করছেন।

যুবতীটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রায় দৌড়ে চলে এলাম গেটের বাইরে। সেখানে কেউ নেই। রাস্তার ওপারে নিশ্চয়ই যাবেনা।

ফিরে এসে অ্যাকাডেমির ঘরগুলো খুঁজলাম তন্নতন্ন করে।

যদি ভুল করে থিয়েটার হলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাই অপেক্ষা করলাম নাটক শেষ হওয়া পর্যন্ত। পৌনে ন'টায় হুড় হুড় করে বেরিয়ে এল বহু নারী-পুরুষ, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমি পরীক্ষা করলাম প্রত্যেকটা মুখ। সবাই বেরিয়ে গেলে মঞ্চ এবং গ্রিনরুম দেখতেও বাকি রাখলাম না।

ফুলমণি কোথাও নেই।

আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। এ কী হল? আমাকে কিছু না বলে কোথায় যাবে ফুলমণি? অনিন্দ্য দাসের বিশ্রী ব্যবহারে রাগ করে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে? তাহলেই তো সর্বনাশ! ফুলমণি কলকাতার কিছুই চেনে না। এত গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তা কী করে পার হতে হয় জানে না।

সামনের রাস্তার এ-দিক থেকে ও-দিক, ময়দানের খানিকটা অংশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনও লাভ হলো না।

তাহলে কি নীপাবউদির বাড়িতে ফিরে গেছে? ঠিকানাও তো জানে না। আসবার সময় ট্যাক্সিতে এসেছি, সেই সব রাস্তা মনে রেখেছে? গ্রামের লোক শহরে এলে দিশেহারা হয়ে যায়, সমস্ত রাস্তাই তাদের এক রকম মনে হয়। তবে যদি ফুলমণির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ হয়, বলা তো যায় না।

এ ছাড়া আর তো কিছু করবারও নেই। একটা ট্যাক্সি পেয়েই বললাম, খুব জলদি, সুইন-হো স্ট্রিট। ঠিক তখনই আকাশ ফাটিয়ে বৃষ্টি নামল। চড়চড়াৎ শব্দে বিদ্যুৎ চিরে গেল কলকাতার এ-প্রান্ত থেকেও-প্রান্ত।

নীপাবউদিআর লালুদা টিভিতে সিনেমা দেখছে।

বুকের ধড়ফড়ানি অতি কষ্টে সামলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি কী করছে? কখন ফিরল?

নীপাবউদি বলল, ফুলমণি! সে একা ফিরবে কী করে? তোমার সঙ্গে আসেনি?

আমি ধপাস করে বসে পড়লাম সোফায়! হাতের তালু ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পায়ে জোর নেই।

সব শুনে লালুদা চক্ষু গোল গোল করে বলল, কেস সিরিয়াস। মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়, আদিবাসী মেয়ে, আমাদের নামে অ্যাবডাকশান চার্জ আনতে পারে। ওহে নিলাম্বুজ, এটা কী করলে?

আমি কী করব বলুন। ও বাথরুমে গেল, তখনও কি আমি ওর পেছন পেছন যাব?

তা-ও যাওয়া উচিত ছিল।

নীপাবউদি বলল, তুমি হুট করে চলে এলে? ওখানেই আছে নিশ্চয়ই। যাবে কোথায়।

আমি সব জায়গায় দেখেছি। কেউ নেই। এখন আর লোকজনই নেই বলতে গেলে।

হয়তো কোনও গাছটাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

মুমু পাশের ঘরে পড়তে বসেছিল। উঠে এসে সব শুনছে। সে-ও বলল, নীলকাকা, তুমি ওকে হারিয়ে ফেললে? এখন কী হবে?

সবাই আমার নামে দোষ দিচ্ছে। আমি যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি।

লালুদা বলল, এক্ষুনি তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়। চলো বেরোই। থানায় একটা ডায়েরি করতে হবে। নীলমণিকে যদি অ্যারেস্ট করে, তার জন্য জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

নীপাবউদি চমকে উঠে বলল, কেন, নীলুকে অ্যারেস্ট করবে কেন?

মুমু এক গাল হেসে বলল, বেশ হবে! নীলকাকাকে জেলে ভরে রাখলে খুব মজা হবে। আমরা দেখতে যাব।

রাত হয়ে গেছে, তাই মুমুর বায়না সত্ত্বেও তাকে সঙ্গে নেওয়া হল না, কাল তার স্কুল আছে। লালুদার সঙ্গে নীপাবউদি আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। বৃষ্টি হঠাৎ থেমে গেছে।

একটা গাড়ি থাকলে কত সুবিধে। নীপাবউদির কথায় থানায় না গিয়ে আমরা আগে গেলাম অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের কাছে।

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, রেড রোড, রেস কোর্স এই সব চক্কর দিয়ে প্রায় পুরো ময়দানটাই ঘুরে দেখা হল। ফুচকা, আলুকাবলির দোকানগুলোও উঠে গেছে, দু'একটা থেমে থাকা গাড়িতে রয়েছে কয়েক জোড়া দুঃসাহসী প্রেমিক-প্রেমিকা, কিছু গোপন মদ্যপায়ী ও কিছু পুলিশ ছাড়া আর কেউ নেই।

লালুদা বলল, মেট্রো রেলের কাজের জন্য অনেক আদিবাসী ওয়ার্কার আনিয়েছে। তারা ময়দানের মধ্যে এক জায়গায় ঝুপড়ি বেঁধে আছে। আমার মনে হয়, মেয়েটা সেখানে চলে গেছে। হয়তো কোনও দেশোয়ালির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে।

নীপাবউদি বলল, সেখানে আমরা যাব কী করে?

লালুদা বলল, দেখোই না!

সত্যি, লালুদা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

টাটা সেন্টারের কাছাকাছি উলটো দিকে গাড়িটা থামাল লালুদা। এখানে মেট্রোরেলের অনেকগুলো গুদাম ঘর, শেড আছে। মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ, অন্ধকার। লালুদার গাড়িতে টর্চও থাকে, লোডশেডিংয়ের সময়ের জন্য। নীপাবউদিকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে লালুদা শুধু আমাকে নিয়ে ভেতরে যেতে চাইল, নীপাবউদি রাজি হল না। এত রাতে নীপাবউদির পক্ষে একা গাড়িতে বসে থাকা বিপজ্জনক।

ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, এক জায়গায় রয়েছে অনেকগুলো বুড়ি। কলকাতার একেবারে বুকের ওপর একটা আদিবাসী গ্রাম। একজন গার্ড প্রথমে আমাদের বাধা দিয়েছিল, লালুদা তার হাতে একটা কুড়ি টাকার নোট গুঁজে দিতে সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাদের।

কিছু লোক এক জায়গায় গোল হয়ে বসে আছে, মাঝখানে জ্বলছে একটা হ্যাজাক। সেখানে হাত ধরাধরি করে নাচছে দুটি মেয়ে। অন্যরাহাততালি দিচ্ছে। তাদের পাশে পাশে দিশি মদের বোতল।

প্রথমে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। যে-দু'জন নাচছে, তাদের মধ্যে একজন ফুলমণি নয়? সেই রকম নীলপাড় শাড়ি, মাথায় ফুল গোঁজা।

ফুলমণি যদি আমাকে কিছু না বলে চলে এসে এখানে এসে নাচত, তাহলে আমি তাকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারতাম না। না, এ দুটি মেয়ের এক জনও ফুলমণি নয়।

আমাদের দেখে নাচ থেমে গেল। ওরা মনে করল, আমরা পুলিশ। ওরা যদিও বে-আইনি কিছু করছেনা, মদটা ওদের খাদ্যের মধ্যে পড়ে, আর নিজেরাই নাচ-গানে মেতে আছে। তবু বিনা কারণেও পুলিশের ঝামেলা করতে তো বাধা নেই।

ওদের সব বুঝিয়ে বলা হল। ছোটপাহাড়ি থেকে কেউ এসেছে? ফুলমণি নামে কোনও মেয়েকে চেনে?

এরা এসেছে বীরভূম থেকে। ছোটপাহাড়ি কোথায় তা এরা জানে না। এখানে ফুলমণি নামে কেউ নেই।

লালুদা অদম্য। গাড়িতে ফিরে এসে বলল, আমার মাথায় আর একটা আইডিয়া এসেছে। কী বলো তো?

লালুদার মাথার আইডিয়া আন্দাজ করার মতো প্রতিভা আমার নেই।

লালুদা বলল, কলকাতায় অনেক মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। রাইট? সেখানে অনেক মিস্তিরি-মজুর কাজকরে, রাইট? মেয়েরা মাথায় করে ইট বয়ে নিয়ে যায়? সেরকম কোনও বাড়িতে মজুরনিদের কাজ করতে দেখে ফুলমণির দেশের কথা মনে পড়ে গেছে। ফুলমণি অমনি তাদের কাছে ছুটে গেছে। কী যেতে পারে না। তুমি কী বলল, নীলধ্বজ?

নীলধ্বজনামে কোনও ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কিছু মতামত দিতে পারত, কিন্তু আমার মাথাটা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। কিছুই ভাবতে পারছি না।

লালুদা বলল, লেটস গো।

চৌরঙ্গির ওপরেই তৈরি হচ্ছে একটা এগারতলা বাড়ি। গাড়ি চলে এল সেখানে। চার জন গার্ড মালপত্র পাহারা দিচ্ছে, কোনও মিস্তিরি-মজুররাত্তিরে দেখানে থাকেনা।

এরপর থিয়েটার রোড।

এখানে যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে তার কন্ট্রাক্টর লালুদার চেনা।

দারোয়ানরা বসে বসে রুটি পাকাচ্ছে, লালুদা তাদের ঘরে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল, সুখেন্দুবাবু হ্যায়?

পাগল না হলে সুখেন্দুবাবু নামক কন্ট্রাক্টরের এত রাতে এখানে থাকার কথা নয়। কিন্তু ওইনামটা বলে দারোয়ানদের কাছে নিজের দর বাড়িয়ে নিল লালুদা। তারপর আসল কথাটা পাড়ল।

দারোয়ানদের মধ্যে একজন বেশ রসিক। সে জানাল যে, ফুলমণি নামে কেউ নেই। আজ নতুন কোনও মেয়ে আসেনি। তবে, চারটি মুসলমান কামিন এখানে থাকে, তাদের কারুকে লাগবে?

নীপাবউদি বিরক্ত হয়ে বলল, দুর, এ-ভাবে খোঁজা যায় নাকি? এটা পাগলামি হচ্ছে।

লালুদা বলল, তবে তো থানায় যেতেই হয়, হাসপাতালগুলোতেও খোঁজ নিতে হবে। যাওয়া হল ওয়াটগঞ্জ থানায়। ময়দান অঞ্চল ওই থানার এক্তিয়ারে।

এখানে নীপাবউদি গাড়িতেই বসে রইল। লালুদা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে বলল, কথাবার্তা যা বলার আমি বলব, বুঝলে নীলরতন। তুমি চুপ করে থাকবে। নইলে তোমাকে যদি ফস করে অ্যারেস্ট করে ফেলে। অবশ্য অ্যারেস্ট করলেও তোমাকে ছাড়াবার ক্ষমতা আমার আছে।

দারোগাবাবু পাতলা কাগজে তামাকভরে সিগারেট বানাচ্ছেন। লালুদা দরজার কাছ থেকেই সাড়ম্বরে বলল, নমস্কার। কী খবর, ভাল?

দারোগা প্রতিনমস্কার না দিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

টেবিলের ওপর হাত দিয়ে ঝুঁকে লালুদা বলল, একটি আদিবাসী মেয়ে, বুঝলেন, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস হবে, সন্ধে থেকে হারিয়ে গেছে।

দারোগা ভুরু নাচিয়ে বলল, হারিয়ে গেছে, না পালিয়ে গেছে? কোথায় মাইফেল বসেছিল?

মাইফেল মানে? ও, না না, সেসব কিছুনা। ফুলমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফুলমণি নামে আদিবাসী মেয়ে? কোনও আদিবাসী মেয়ে কক্ষনও হারায় না। সেরকম কোনও রেকর্ড নেই আজ অবধি।

হ্যাঁ, হারিয়েছে। ফ্যাক্ট। ডায়েরি লিখুন।

মার্ডার-ফার্ডারক রে আসেননি তো? রাত সাড়ে এগারোটায় হঠাৎ একটা আদিবাসী মেয়ে সম্পর্কে এত দরদ?

না না, সে ছবি আঁকে।

ছবি আঁকে! ও-ও-ও-ও। ছবি আঁকলে আর মার্ডার করা যায় না?

আপনি আমার কথা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না।

আপনার কথা কিছু বুঝতেই পারছি না মশাই।

জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার আমার বন্ধু! আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড!

সেকথা আগে বলেননি কেন? জয়েন্ট সিপিকিংবা সি পি কিংবা কোনও আই জি যদি আপনার বন্ধু হয় তাহলে আপনি মার্ডার-ফার্ডার যা খুশি করতে পারেন। সে-সব বুঝবে লালবাজার। এখানে কেন?

আই ইনসিস্ট!

আপনি সরুন না মশাই। ওই ছেলেটিকে বসতে দিন।

দারোগা আমার দিকে ভুরুর ইঙ্গিত করে বলল, কী হয়েছে বলো তো ভাই! ঠিক দু'লাইনে বলবে, বেশি সময় নষ্ট করবে না।

আমি মুখস্থ কবিতার ভঙ্গিতে বললাম, ছোটপাহাড়ি থেকে একটি সাঁওতাল মেয়েকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে ভাল ছবি আঁকে। আজ তার ছবির প্রদর্শনী ছিল অ্যাকাডেমিতে। সন্ধের পর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরনে...।

ব্যাস, ব্যাস, দুলাইন হয়ে গেছে। মেয়েটার ছবি কোথায়?

ওর ছবি তো অ্যাকাডেমিতে টাঙানো হয়েছে।

ওই ছবির কথা বলছিনা। ফটোগ্রাফ। মেয়েটির ফটোগ্রাফ।

তা তো তোলা হয়নি।

কেন হয়নি?

লালুদা বাধা দিয়ে বলল, সেকি আমাদের আত্মীয় যে তার ছবি তুলে রাখব?

দারোগা লালুদাকে ধমক দিয়ে বলল, আত্মীয় যদি না হয়, তাহলে সে হারিয়ে গেছে বলে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?

তারপর দারোগা আমাকে বলল, চিন্তার কিছু নেই। বাড়ি যান। সে নিশ্চয়ই নিজের দেশে ফিরে গেছে। কলকাতা শহরের মতো একটা জঘন্য জায়গা তার ভাল লাগবে কেন? আমারই ভাল লাগে না। চান তো ডায়েরি লিখে নিচ্ছি। কোনও দরকার নেই যদিও।

থানা থেকে বেরিয়ে এসে লালুদা বলল, ও ব্যাটারা খুঁজবে না। পলিটিক্যাল লিডার ছাড়া আর কারুর কথা শোনেই না! লালবাজারে গিয়ে প্রেশার দিতে হবে!

বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ এখন থমথমে, চমক দিচ্ছে বিদ্যুৎ। সিনেমার নাইট শো ভেঙেছে, তাই রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেড়ে গেল হঠাৎ। দোতলা বাস ভর্তি মানুষ! সন্ধে থেকে কিছু খাইনি। খিদের কথা এতক্ষণ মনেও পড়েনি। এখন গরুর গাড়ির চাকার মতো ঘর্ঘর শব্দে জেগে উঠল খিদে।

লালুদা বলল, কলকাতা শহরে এত গাড়ি-ঘোড়া, ট্রাম-বাস, তার মধ্যে গ্রামের একটা অবলা মেয়ে...একটা বনের হরিণীকে এনে যদি কলকাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে বল তো!

আমি থ। এত রাত্রে আচমকা কবিত্বশক্তি জেগে উঠলো লালুদার। ফুলমণি..বনের হরিণী।

.

০৮.

পরদিন সকাল এগারোটার মধ্যেও কোনও খবর পাওয়া গেল না। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, এমনকী এক পুলিশ বন্ধুকে ধরে মর্গেও ঘুরে এসেছে লালুদা। ফুলমণি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সিরাজুল সাহেবের বাড়িতে যাওয়া হল।

অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে আমার ঝগড়ার ঘটনাটা এর মধ্যেই তার কানে এসেছে। দু' জন তরুণ শিল্পী বসে আছে তার ঘরে। আমার কাছে সব বিবরণ শুনে তার মুখে দুঃখের ছায়া পড়ল, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। কেন ওকে নিয়ে এলাম ওর গ্রাম থেকে। ওখানেই বেশ ছিল। শহরে কত খারাপ লোক আছে।

এক জন শিল্পী বলল, শুনেছি কিছু লোক কলকাতা থেকে মেয়ে ধরে ধরে বম্বেতে বিক্রি করে দিয়ে আসে। আরব দেশগুলোতে অনেক মেয়ে চালান হয়।

সিরাজুল সাহেব বললেন, ওর কাছে কি টাকা-পয়সা কিছু ছিল? এমন কি হতে পারে যে, আমাদের শিল্পীবন্ধুটির কথাবার্তায় ও অপমানিত বোধ করেছে তাই তক্ষুনি হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে চেপে তাতে ছোটপাহাড়িতে ফিরে গেছে?

ফুলমণিকে আমি একশো টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু ও কি নিজে নিজে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে?

সিরাজুল সাহেব বললেন, রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে করে হাওড়া পৌঁছে যাওয়া খুবই সম্ভব। ফুলমণি কথা কম বলে বটে, কিন্তু বোকা তো সে নয়। বোকা মানুষেরা শিল্পী হতে পারে না।

এক জন শিল্পী বলল, যাই বলুন স্যার, আঙুল দিয়ে ছবি আঁকাটা ঠিক প্রপার আর্ট ফর্মনয়। ওকে তুলি ধরতে শেখাতে হবে।

সিরাজুল সাহেব বললেন, ওসব কথা এখন থাক। আগে মেয়েটির নিরাপত্তা...আচ্ছা, ছোটপাহাড়িতে টেলিফোন করে জানা যায় না?

আমি বললাম, ওখানে এখনও টেলিফোন যায়নি। আমি ভাবছি, আজই আমি একবার চলে যাব।

সিরাজুল সাহেব বললেন, কাল আমার একটা খুব জরুরি মিটিং আছে বটে। তবু আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি। থাক কাজ। হ্যাঁ, চলুন আমি যাব।

এক জন শিল্পী বলল, সে কী স্যার? আজ বিকেলে আপনার...।

সিরাজুল সাহেব বললেন, তাতে কী হয়েছে। তোমরা ম্যানেজ করবে। আমি যাব, কটায় ট্রেন আছে নীলুবাবু?

তরুণ শিল্পীটি বলল, আজ সিরাজুল সাহেবের জন্মদিন। সন্ধেবেলা একটা অনুষ্ঠান আছে, অনেকে আসবে এ-বাড়িতে।

সিরাজুল সাহেব তবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, আপনার যাওয়ার কী দরকার? আমি গিয়ে খবর নিয়ে আসছি। ফুলমণিকে ওখানে পাওয়া গেলে আপনাকে জানাব, আমি ফিরেই দেখা করব।

অন্য শিল্পীটি বলল, সব দোষ অনিন্দ্য দাসের। উনি যা খুশি করবেন। কিন্তু ওর মুখের ওপর কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।

সিরাজুল সাহেব মিনতির সুরে বললেন, আমার বাড়িতে ও-সব কথা আলোচনা কোরো না, প্লিজ।

অর্থাৎ সিরাজুল সাহেব নিজে তো নিন্দে করবেনই না, অন্য কারুর মুখে নিন্দে শুনতেও চান না।

এত কাণ্ডের মধ্যেও আমার এই একটি পরম লাভ হল, সিরাজুল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হল।

বড় মাপের মানুষ না হলে কি বড় শিল্পী হওয়া যায়? এই প্রশ্নটা অনেক দিন ধরে আমার মাথায় ঘুরছিল।

দরজা পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিতে এসে সিরাজুল সাহেব মৃদু গলায় বললেন, আপনি একলা একলা যাবেন, যদি আপনার কিছু রাহাখরচ...।

আমি বললাম, আমি তো ওখানে চাকরি করি। আমাকে তো এমনিই যেতে হত। চন্দনদাকে খবরটা জানানো দরকার।

সিরাজুল সাহেব বললেন, তাড়াতাড়ি ঘুরে আসুন। ভাল খবর নিয়ে আসুন। উনি আমার হাত ধরলেন।

আমি বললাম, দোয়া করবেন।

এখানকার খবরাখবরের ভার রইল লালুদার ওপর। লালুদা বলল, কোনও চিন্তা কোরো না। ফুলমণির খোঁজ পেলেই আমি তোমাকে কুরিয়ার সার্ভিসে জানিয়ে দেব। এমনকী নিজেও চলে যেতে পারি।

নীপাবউদি বলল, নীলু, তুমি তোমার চন্দনদাকে বিশেষ ব্যস্ত হতে বারণ করো। ফুলমণি যদি ছোটপাহাড়িতে না গিয়ে থাকে, এখানে তার সন্ধান পাওয়া যাবেই। মেয়েটা তো আর উধাও হয়ে যেতে পারে না।

লালুদা বলল, নানা, চন্দনের এখন কলকাতায় আসার দরকার নেই। সে কত কাজে ব্যস্ত। আমরা এদিকটা ঠিক ম্যানেজ করে নেব। সন্ধেবেলা অ্যাকাডেমিতে আর্ট একজিবিশনেও আমি বসে থাকব।

যে-যার তালে আছে। চন্দনদা কলকাতায় না থাকলে লালুদার পক্ষে এ-বাড়িতে আড্ডা জমানোর বেশি সুবিধে হয়।

হাওড়ার বাসে চাপবার সময় আমার মনে হল, অনিন্দ্য দাশের বাড়ি দমদম। উনি বিয়ে-টিয়ে করেননি। একা থাকেন। ছোটপাহাড়ি যাবার আগে ওঁর নাকে একটা ঘুষি মেরে যাওয়া উচিত নয় কি? যতনষ্টের গোড়া!

কিন্তু দমদম একেবারে উলটো দিকে। সেখান থেকে ঘুরে হাওড়ায় যেতে হলে আর ছোটপাহাড়ির ট্রেন পাবনা। সেই জন্যই অনিন্দদাস আমার হাতের ঘুঁষি থেকে বেঁচে গেলেন। কিংবা আমি ওর লাঠির আঘাত থেকে বেঁচে গেলাম বোধহয়।

হাওড়া স্টেশনে শান্তনু চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। উনি ললিতকলা অ্যাকাডেমির কোনও মিটিঙে যোগ দিতে মাদ্রাজ যাচ্ছেন। চন্দনদার পেছনে এক তল্পিবাহক হিসেবে উনি আমাকে একবার মাত্র দেখেছেন, আমাকে ওঁর চেনার কথা নয়। তবু উনি চিনতে পারলেন। ট্রেনটা এখনও আসেনি, আমরা অপেক্ষা করছি, উনি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকলেন কাছে।

ছাই রঙের স্যুট ও টাই পরা, নিখুঁত লোশাক। মসৃণ মুখ। পাট করা চুল। উচ্চ-মধ্যবিত্তের পরিচয় ওঁর সর্ব অঙ্গে লেখা, কেউ আর্টিস্ট হিসেবে ভুল করবে না। অথচ ভাল ছবি আঁকেন।

শান্তনু চৌধুরী খানিকটা ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বললেন, শুনুন, সে-দিন আপনার নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। আপনি চন্দনের ভাই, তাইনা?

কথা না বাড়িয়ে আমি মাথা নেড়ে দিলাম।

শান্তনু চৌধুরী বললেন, অনিন্দ্য নাকি এক কাণ্ড করেছে? আপনাকে আর ওই মেয়েটিকে নিয়ে...ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো?

মানুষের চরিত্রে যতগুলো খারাপ দিক থাকে, তার মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট হল অসাক্ষাতে কোনও বন্ধুর নিন্দে উপভোগ করা। শান্তনু চৌধুরীকে সবাই অনিন্দ্য দাসের খুব বন্ধু বলে জানে।

এ ব্যাপারটাতে আমি প্রশ্রয় দেব কেন? আমি উলটে বললাম, আপনি কী শুনেছেন?

শান্তনু চৌধুরী এক ঝলক হেসে বললেন, অনিন্দ্য নাকি ওই সাঁওতাল মেয়েটার কাপড় ধরে টেনেছে সবার সামনে?

এবার বোঝা গেল যে, শান্তনু চৌধুরী নিখুঁত ভদ্রতার প্রতিমূর্তি হলেও ওঁর ঝোঁক আদিরসের দিকে।

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।

শান্তনু চৌধুরী বললেন, আর একবার কী হয়েছিল জানেন? একটা পার্টিতে অনিন্দ্য এমন বেসামাল হয়ে গেল, ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার মিস্টার নানপুরিয়ার বউকে, সে-মেয়েটি একবার মিস ইন্ডিয়া হয়েছিল, সবার সামনে অনিন্দ্য তাকে বলল, তোমার ওই ইয়ে দুটো, বুঝলেন না। ইয়ে, ওই দুটো কি ফলস? লজ্জায় আমরা মুখ তুলতে পারি না।

তারপর থেকে মিসেস নানপুরিয়ার দিকে তাকালেই আমরা ওঁর ইয়ে দুটোর দিকে, ফলস আসল।

ট্রেন ঢুকতেই একটা শোরগোল পড়ে গেল।

শান্তনু চৌধুরী এ. সি ফার্স্ট ক্লাসে যাবেন, তাকে আর দেখা গেল না।

আমার শরীর-মন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে, ট্রেন চলতে শুরু করার পরেই আমি ঘুমে ঢুলতে লাগলাম।

এই দুরপাল্লার ট্রেনটা বালুঘাই স্টেশনে একমিনিটের জন্য থামে। কেন অত ছোট স্টেশনে থামে তা কে জানে! আমার পক্ষে সুবিধেজনক।

একটাই মুশকিল, রেলস্টেশন থেকে ছোটপাহাড়ি যেতে বাস ছাড়া উপায় নেই। রাত আটটায় শেষ বাস ছেড়ে যায়। এই ট্রেনটা লেট করলেই চিত্তির!

ঠিক লেট হল দেড় ঘণ্টা।

আজকাল যেহেতু ছোটপাহাড়িতে নানা রকম কনস্ট্রাকশন চলছে, তাই মালপত্র নিয়ে অনেক ট্রাক যায়। ট্রাকগুলোর দিন-রাত্রি জ্ঞান নেই। চন্দনদা প্রথম দিনই আমাকে বলে দিয়েছিল, যদি কোনও দিন বালুঘাই স্টেশনে পৌঁছে বাস মিস্ করিস, তাহলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে হাত দেখাবি, কোনও না কোনও ট্রাক তোকে পৌঁছে দেবে।

এত ছোট স্টেশনে দশ-পনের জনের বেশি যাত্রী ওঠানামা করেনা।

অনেক আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেছে, তবু ঘুম ঘুম চোখে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে আমি বড় রাস্তার দিকে এগোতে যাচ্ছি, এমন সময় কে যেন ডাকল, মি. নীললোহিত!

দৈববাণী নাকি? কিন্তু ঠাকুরদেবতারা কি আমাকে মিস্টার বলবে? কে জানে, আজকাল হয়তো ঠাকুরদেবতারা খুব হিন্দি ফিল্ম দেখে।

প্রায় যেন মাটি খুঁড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মহিম সরকার। আমার হাত ধরে বললেন, আরে মশাই, আপনাকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না? চলুন, আমার জিপ আছে। ওই যে ডান দিকে।

আমি বললাম, আপনি এখানে কেন?

আসলে আমার মাথা থেকে ঘুম কাটেনি। মহিম সরকারকে দেখে তো আমার খুশি হবারই কথা।

উনি ওঁর কোনও আত্মীয়কে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। বেশ সহজে আমি লিফট পেয়ে গেলাম। তবু যেন আমার মনে হচ্ছে, হাইওয়েতে গিয়ে আমাকে হাত দেখিয়ে কোনও ট্রাক থামাতে হবে।

আমাকে টেনে তুলে মহিম সরকার ড্রাইভারের পাশের সিটে বসিয়ে দিলেন। জিপ চালাচ্ছেন উনি নিজে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার পর মহিম সরকার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী খবর বলুন। কলকাতায় সব ঠিকঠাক হল?

আমি বললাম, হ্যাঁ, খবর খুব ভাল, খুব ভাল। যে-জন্য গিয়েছিলাম, অত্যন্ত সাকসেসফুল। ছোটপাহাড়ির খবর কী?

ছোটপাহাড়ির খবর ঠিকইআছে। আপনার ওখানকার তেতলায় কনস্ট্রাকশন অনেকটা হয়ে গেছে। মি. নীললোহিত, ছাদ ঢালাইয়ের সময় কিন্তু আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। জানেন তো, ঢালাই একবার থেমে গেলে কত ক্ষতি হয়?

থাকব। নিশ্চয়ই থাকব।

ফুলমণি আবার কাজ করবে?

ফুলমণি?

আপনি এত চমকে যাচ্ছেন কেন? ফুলমণি, যে ভাল ছবি আঁকে। সে ফিরেছে নিশ্চয়ই? তাকে তো আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কলকাতায়।

হ্যাঁ, কিন্তু সে কি একলা ফিরতে পারে না?

তা তো আমি জানি না। কিন্তু নীললোহিত, আমি যত দূর জানি, সে ফেরেনি। সবাই জানে, আপনি তাকে কলকাতায় নিয়ে গেছেন। আপনিও আর ফিরবেন না, সে-ও ফিরবেনা।

আরে মোলো যা! আমার ফেরার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? ফুলমণি আমার কে?

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আমি সজাগ হলাম। এ-সব আমি কী বলছি? লালুদা আর নীপাবউদি পই পই করে বলে দিয়েছিল, ফুলমণির হারিয়ে যাবার খবরটা যেন চন্দনদার আগে অন্য কারুকে জানানোনা হয়। ঘুমের ঘোরে আমার গুলিয়ে গেছে সবকিছু।

মহিমবাবু আমার দিকে ত্যারছা চোখে তাকিয়ে আছেন।

কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললাম, আমাকে মিস্টার মিস্টার বলেন কেন মহিমবাবু? আমি ক্লাস থ্রি স্টাফ, আপনার মতো তো অফিসার নই। আপনার থেকে আমি বয়সেও অনেক ছোট। আমাকে শুধুমাম ধরে ডাকবেন।

ও একথাটা প্রথম দিন বললেই পারতেন। আমি ভেবেছিলাম বড় সাহেবের ভাই।

সিগারেট খাবেন? এখানে বৃষ্টি হয়নি? কাল কলকাতায় কী তুমুল বৃষ্টি।

ফুলমণিকে কোথায় রেখে এলেন?

এ যে ভবী ভোলবার নয়। ঘুরেফিরে আবার সেই ফুলমণির কথা। কেন যে মহিমবাবুর জিপে উঠলাম।

ও তো কলকাতাতেই রয়ে গেছে। ওর একজিবিশান যত দিন চলবে...ওর ছবির খুব নাম হয়েছে, বুঝলেন।

তবে কেন জিজ্ঞেস করলেন ফুলমণি ফিরেছে কিনা?

ওটা এমনিই আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।

হুঁ!

আমি বুঝব কী করে মহিমবাবু এর মধ্যে তার শালা কিংবা ভাইপোর চাকরি মনে মনে পাকা করে ফেলেছেন। বাকি রাস্তা তিনি আমার সঙ্গে কোনও কথা বললেন না। আমি গল্প জমাবার চেষ্টা করলেও হুঁ-হাঁ করে সারলেন।

জঙ্গলটা পেরিয়ে ছোটপাহাড়িতে পৌঁছে বাজারের কাছটায় এসে মহিমবাবু বললেন, একটা মুশকিল হয়েছে, আমার জিপে ডিজেল খুব কম, আপনার গেস্ট হাউসে পৌঁছোতে গেলে...আমার গাড়ি সম্পূর্ণ উলটো দিকে...যদি ডিজেল একেবারে ফুরিয়ে যায়? আপনি এইটুকু হেঁটে যেতে পারবেন?

লোকটা মহা কিপ্যুস তো। দেড় ঘণ্টা জিপ চালিয়ে এল, আর দশ মিনিট চালালেই ডিজেল ফুরিয়ে যাবে? আসলে আমাকে অবজ্ঞা দেখাতে চায়।

তবু ওঁকে খাতির করে বললাম, না না, আমার বাড়ি বাঁ-দিকে, আপনি এখান থেকে ঘুরে চলে যান। আমি এইটুকু রাস্তা সচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পারব। মালপত্র কিছু নেই, আপনি যে এতটা পৌঁছে দিলেন, তাতেই কত উপকার হল। ট্রাক ধরে এলে পয়সা লাগত!

গাড়ি থেকে নেমে বললাম, আচ্ছা। কাল দেখা হবে।

মহিমবাবু বললেন, নিশ্চয়ই!

ছোট্ট বাজার, অনেক আগেই আলো টালো নিবিয়ে সব ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। বাজারের পেছনে একটা নতুন কুলি বস্তি, ক্ষীণ গান-বাজনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সেখানে।

আমার রাস্তা ডান দিকে, সম্পূর্ণ অন্ধকার।

এ-রকম অন্ধকার, এ-রকম নিস্তব্ধতা কলকাতায় দেখা যায় না। গাড়ি-টাড়ি তো দূরের কথা, একটাও মানুষ নেই পথে। দু'পাশে এখনও প্রচুর ফাঁকা মাঠ, দূরে দূরে বাড়ি, সে-সব বাড়ির লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে নটা-সাড়ে ন'টার মধ্যে। টিভি নেই তো, ভদ্রলোকেরা জেগে থাকবে কী করে?

গেস্ট হাউসে নয়, আগে যেতে হবে চন্দনদার বাড়িতে।

চন্দনদা কোনও কোনও দিন দেড়টা-দুটো পর্যন্ত জেগে পড়াশুনো করে, আবার কখনও ঘুমিয়ে পড়ে রাত দশটার মধ্যে। কোনও ঠিক নেই। আজ ঘুমিয়ে পড়লেও জাগাতেই হবে। ফুলমণির দায়িত্বটা আমি এবার চন্দনদার ওপর দিয়ে দিতে চাই, আমি আর পারছি না।

কাছেই পাহাড় ও জঙ্গল আছে বটে কিন্তু নির্জন রাস্তায় হঠাৎ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। তবে সাপ বেরোয় প্রায়ই। বিশেষত বৃষ্টির দিনে। সাপ তাড়াবার শ্রেষ্ঠ উপায় মাটিতে জোরে জোরে শব্দ করা। আমি চটি দিয়ে ধপাস ধপাস করে এগোতে লাগলাম।

নিজের পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাওয়ার কথা নয়। হঠাৎ যেন আরও কয়েকটা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকারের মধ্যেই চলন্ত অন্ধকার হয়ে গোটা কয়েক লোক ছুটে আসছে। ওরা কারা কে জানে, আমি সরে দাঁড়ালাম এক পাশে।

লোকগুলো কিন্তু আমারই কাছে এসে থেমে গেল এবং ঘিরে ফেলল। মিস্তিরি-কুলি শ্রেণির মানুষ, কয়েক জনের হাতে লাঠি।

একজন জিজ্ঞেস করল, এ বাবু, ফুলমণি কোথায়?

লোকগুলোকে ঠিক চিনতে পারছি না। ও-রকম রুক্ষ স্বরের প্রশ্ন আমার পছন্দ হল না। ফুলমণি, সে-কৈফিয়ৎ যদি দিতে হয় তার শ্বশুরকে দেব, এরা কারা?

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কে?

সেই লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, ফুলমণি কোথায়?

সে কলকাতায় আছে।

তাকে আনলি না কেন?

তার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

তুই নিয়ে গেছিস, তুই আনবিনা?

সে এখন...।

আমার কথাটা শেষ করতে দিল না, একজন আমার মাথার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। আর এক জন পিঠে মারল লাঠির বাড়ি।

আমি লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করে বললাম, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার কোনও দোষ নেই, ফুলমণি–।

ওরা আমাকে কোনও কথা বলতে দিতে চায় না। সবাই চালাল কিল-চড়-ঘুষি। এবার পালানো ছাড়া উপায় নেই। দৌড় মারবার চেষ্টা করতেই এক জন আমার পায়ে খুব জোরে একটা লাঠির ঘা কষাল। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম, পাথুরে রাস্তায় কপালটা ঠুকে গেল, ছেঁচে গেল নাক।

এবার একজন আমার মাথা ঘেঁষে কাঁধে যে জিনিসটা দিয়ে মারল, সেটা লাঠি না লোহার রড? যাই-ই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, মোট কথা আমার মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে বুঝতে পারছি।

আরও মারছে আর কত মারবে!

সেই অবস্থায় আমার মনে পড়ল, ভাগ্যিস সিরাজুল তারিক সাহেব আমার সঙ্গে আসেননি। যদি তাকেও এরা…।

আমি গড়াবার চেষ্টা করেও পারছিলাম না। আর কিছু চিন্তাও করতে পারছি না কেন? চোখের মধ্যে যেন অনবরত বিদ্যুতের ঝিলিক দিচ্ছে। আমি কি অজ্ঞান হচ্ছি, না মরে যাচ্ছি? মৃত্যুর সময় বুঝি চোখে এরকম ঝিলিক খেলে? এরা আমাকে শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলল? ছি ছি ছি ছি।

একেবারে শেষ মুহূর্তে আমি টের পেলাম বৃষ্টি নেমেছে। আমার শেষ চিন্তাটা এই যে, ছোটপাহাড়িতে আমার চাকরি এই শেষ। এক মাসের মাইনেটাও পেলাম না? এরা আমাকে পুরো একটা মাসও চাকরি করতে দিল না। আজ মাসের উনতিরিশ তারিখ। মায়ের হাতে তুলে দিতে পারলাম না একটা টাকাও। আমি একটা অপদার্থ।

৯-১০. দিকশূন্যপুরে

চিরকাল একজনের দোষে অন্য এক জন মার খায়।

হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যে হাজার হাজার মানুষ অ্যাটম বোমার ঘা খেয়ে মরেছিল, তারা কি যুদ্ধ বাধাবার জন্য দায়ী ছিল? দাঙ্গার সময় মরে শুধু নিরীহ লোকেরা, যারা অস্ত্র ধরতেই জানে না। দুই গুণ্ডার দলের বোমা মারামারির সময় শিয়ালদার কাছে প্রাণ দিয়েছিল শুধু একটি স্কুলের মেয়ে।

আড়াই বছর আগে ছোটপাহাড়ি থেকে এক জন কন্ট্রাকটর নাকি একটি বেশ ডবকা আদিবাসী মেয়েকে ফুসলে নিয়ে গিয়েছিল। তা আমি জানব কী করে? সেই কারণে ছোটপাহাড়ির লোকেরা সন্দেহপ্রবণ হয়ে আছে। আমি কি ফুলমণিকে ফুসলে নিয়ে গেছি নাকি? আহা একে ফুসলানি বলে, আমি তার হাতও ধরিনি একবার, সব মিলিয়ে তার সঙ্গে আড়াইখানা বাক্য বিনিময় হয়েছে কি না সন্দেহ।

আড়াই বছর আগেকার সেই ঠিকাদার পালিয়ে গিয়ে দিব্যি মজা মারল, তাকে কেউ ধরতে ছুঁতে পারল না, তার বদলে মার খেয়ে মরলাম আমি!

না, ঠিক মরিনি অবশ্য। বেকারের জান খুব কড়া হয়। বেকাররা যদি পটাপট মরে যেত, তাহলে তো এ-দেশের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। বেকাররা মরে না, তারা রক্তবীজের মতো বাড়ে।

মাথা ও ঘাড়ের ঘা শুকিয়ে গেছে, ঝামেলা বাঁধিয়েছে বাঁ পাটা। ঢাউস একটা প্লাস্টারের পোশাক পরিয়ে আমায় বিছানায় শুইয়ে রেখেছে এক মাস। হাঁটুর মালাইচাকি আর গোড়ালি নাকি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

মাকে বলা হয়েছে যে, আমি পাহাড়ে ট্রেকিং করতে গিয়ে এক খাদে পড়ে গিয়েছিলাম। দুর্ঘটনার চেয়ে মানুষের হাতে মার খাওয়া মায়েদের চোখে বেশি ভয়াবহ। কারণ যারা

মেরেছে তারা আবার মারার চেষ্টা করতে পারে। আমি অবশ্য হালফিল আর ছোটপাহাড়িতে যাচ্ছি না।

নীপাবউদিরা প্রায়ই আমাকে দেখতে আসে। চন্দনদা দু'বার ঘুরে গেছে। প্রায় প্রতি দিন আসে লালুদা। লালুদা এলেই আমি মুখের ওপর চাদর টেনে, ঘাপটি মেরে ঘুমের ভান করে থাকি। লালুদার বাক্যস্রোত কি রোজ সহ্য করা যায়? অথচ একটা মানুষকে বাড়িতে আসতে বারণ করা যায়?

লালুদা আসে দুপুরের দিকে। নিজস্ব ব্যবসা, যখন তখন ছুটি। আমার সন্দেহ হচ্ছে লালুদা এই সুযোগে আমার বউদির সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করবে। বউদি সকালের স্কুলে পড়াতে যায়, সারা দুপুর বাড়িতে থাকে। বিবাহিতা বউদের সঙ্গে প্রেম করা লালুদার দ্বিতীয় পেশা।

আমার বউদি দুটো মিষ্টি কথায় গলে যাবার মতো মেয়ে নয়। লালুদার কাঠালি কলা মার্কা ঠোঁট কোনও মেয়ের পছন্দ হবেই বা কেন? কিন্তু লালুদার একটি মোক্ষম অস্ত্র আছে। পরোপকার। আমাদের বাথরুমের সিস্টার্ন থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া আজ পর্যন্ত কেউ বন্ধ করতে পারেনি, তলায় গামলা পেতে রাখতে হয়, লালুদা কোথা থেকে এক জাদুকর মিস্ত্রি নিয়ে এসে সেটা সারিয়ে দিল। ঠিকে ঝি দেশে গিয়ে আর ফেরেনি, লালুদা এনে দিয়েছে এক আদর্শ কাজের মেয়ে, যে মাইনে কম নেয়, ফাঁকি মারে না। মা ও বউদির কাছে লালুদার ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল।

আমাকে প্রায়ই সান্ত্বনা দিয়ে লালুদা বলে, তোমার কোনও চিন্তা নেই নীলকণ্ঠ, তুমি সেরে উঠলেই তোমাকে আমি অন্য চাকরি জোগাড় করে দেব। ও-রকম ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরেও যেতে হবে না।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আবার চাকরি! আমার কপালে চাকরি সয় না।

মুমু এক দিন এসে বলল, অ্যাই, তুমি সব সময় শুয়ে থাকো কেন? লেজি বোনস! শুধু শুয়ে থাকলে তুমি আরও লেজি হয়ে যাবে, আর কোনওদিন হাঁটতে পারবে না।

মুমু এলেই ঘরের মধ্যে টাটকা বাতাস খেলে যায়। জবা ফুলের মতো একটা লাল টকটকে ফ্রক পরে এসেছে মুমু। হাতে একটা চকোলেট বার। বাচ্চা ছেলেকে লোভ দেখাবার মতো করে বলল, তুমি যদি আজ হাঁটতে পারো, তোমাকে এই চকোলেট খাওয়াব।

আমার হাত ধরে টেনে বিছানা থেকে নামাল মুমু। তারপর সুর করে বলল, হাঁটি হাঁটি পা পা, খোকাবাবু আসছে সরে যা!

মুমুর কাঁধে ভর দিয়ে এক দিকের দেয়াল পর্যন্ত গেলাম। হাঁটুতে ব্যথা লাগছে বেশ, কিন্তু অসহ্য নয়।

মুমু বলল, রোজ একটু হাঁটতে হয়, না হলে জয়েন্টগুলো খারাপ হয়ে যায়।

তুই কোথা থেকে জানলি রে মুমু?

আমার একবার পা ভেঙেছিল না? প্রত্যেকেরই একবার করে পা ভাঙে।

তা ঠিক বলেছিস। যাদের একবারও পা ভাঙে না, তারা পায়ের মর্ম বোঝে না।

ক্লু; সেবারে তুমি আমাকে দিকশূন্যপুরে নিয়ে যাবে বলে আমাকে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে রেখে এলে। আমার আর দিকশূন্যপুর দেখা হল না। একবার নিয়ে যাবে না?

তোর বয়সী মেয়েদের সেখানে যেতে নেই।

তাহলে তখন বলেছিলে কেন?

তখন তোকে ভোলাবার জন্য...তোর তখন খুব মন খারাপ ছিল।

কেন আমার বয়সীদের দিকশূন্যপুরে যেতে নেই?

ওখানে যারা যায়, তারা সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে যায়, আর ফেরার কথা চিন্তা করে না। তোর এখনও পড়াশুনা বাকি, আরও অনেক কিছু বাকি।

তুমি যাও কেন? তুমি তো ফিরে আসো!

ওখানে বন্দনাদি বলে এক জন আমাকে খুব ভালবাসে। তাকে দেখতে যাই। ওখানে কেউ শুধু শুধু বেড়াতে গেলে অন্যরা পছন্দ করে না। শুধু আমার পারমিশান আছে। আমি দু’ এক জনকে দিকশূন্যপুরে পৌঁছে দিয়েছি।

ওখানে কী আছে বলো না।

খুব সুন্দর জায়গা, যার যেমন ইচ্ছে সেইভাবে থাকতে পারে। প্রত্যেকেই নিজের জিনিসটা তৈরি করে নেয়, কোনও কিছুরই অভাব নেই। যার যেটা বেশি আছে, সে সেটা অন্যকে দেয়, এই রকম ভাবে বদলাবদলি হয়।

কারা ওখানে গিয়ে থাকে?

যারা খুব দুঃখী, যাদের কেউ ঠকিয়েছে, খুব আঘাত দিয়েছে, তারা যায়, ওখানে গিয়ে সব দুঃখ ভুলে যায়।

কোথায় জায়গাটা? কত দূরে?

সে এক নিরুদ্দেশের দেশ। ঠিকানা বলতে নেই!

মুমু অনেক দিন পর আমাকে দিকশূন্যপুরের কথা মনে পড়িয়ে দিল। দিকশূন্যপুর আমাকে টানে। বন্দনাদি, রোহিলা, জয়দীপ, বসন্ত রাও এদের দেখিনি কত দিন।

যে-দিন আমার পায়ের প্লাস্টার কাটা হল, সে-দিন বিকেলে এল চন্দনদা। মুখখানা গম্ভীর। একটা না-জ্বালা চুরুট মুখে দিয়ে বসে রইল চুপ করে।

আমি এক সময় বললাম, আর দুদিন পরেই পুরোপুরি ফিট হয়ে যাব। মধ্যপ্রদেশে আমার এক বন্ধু চাকরি পেয়েছে, আমাকে নেমন্তন্ন করেছে, ওর ওখান থেকে ঘুরে আসব ভাবছি। বস্তারের জঙ্গল।

চন্দনদা বলল, হুঁ, বস্তারের জঙ্গল। তুই জঙ্গল খুব ভালবাসিস, তাইনা নীলু! সুন্দরবনে গেছিস?

অনেক বার।

আমাকে একবার নিয়ে যাবি? আমি সুন্দরবন দেখিনি। আচ্ছা, না থাক।

থাক কেন? সুন্দরবন তো যে-কোনও দিন যাওয়া যায়। তোমার ছুটি থাকলে এই উইকএন্ডেই চলো।

নাঃ, এখন সুন্দরবন যাবনা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে একবার জানলার ধারে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল চন্দনদা। আমার টেবিলের ওপর বইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ফুলমণির খবর পাওয়া গেছে, শুনেছিস তো?

না তো! কোথায়?

লালু তোকে বলেনি?

লালুদা ঠিক দরকারের কথা ছাড়া অন্য সব কথা বলে। কোথায় আছে ফুলমণি! ছোটপাহাড়িতে ফিরে গেছে?

সেখানে ফেরেনি। ফুলমণি থাকে অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে।

আমি দারুণ চমকে গেলাম এবার। অনিন্দ্য দাস? সেই দুর্মুখ শিল্পী? যিনি সেই রাতে ফুলমণিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন?

চন্দনদা বলল, নাঃ, জোর-টোরের ব্যাপার নেই। প্রেমের ব্যাপার। যাতে যার মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম।

অনিন্দ্যবাবু কখন ফুলমণির প্রেমে পড়লেন?

অনিন্দ্য তো প্রেমে পড়েনি, সে প্রেম-ট্রেমে বিশ্বাসই করে না। এক্ষেত্রে অনিন্দ্যই হচ্ছে ডোম, তার প্রেমে পড়েছে ফুলমণি।

কী উলটো-পালটা বলছ চন্দনদা? ফুলমণি কারুর প্রেমে পড়তে পারে নাকি? মানে...অনিন্দ্যবাবুকে সে কতটুকু দেখেছে?

শোন, তুই কানু রায়কে চিনিস? কানু রায় ছবি আঁকে না। কিন্তু সেসব ছোট-বড় শিল্পীদের চেনে, আর্ট ওয়ার্লডে ঘোরাফেরা করে। সেই কানু রায় গিয়েছিল অনিন্দ্যর বাড়িতে। সে দেখে এসেছে, ওরা দু'জনে বেশ মজায় আছে, দু'জনেই ছবি আঁকছে। ফুলমণি নাকি তাকে বলেছে যে, অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে সে যত শিল্পীকে দেখেছে, তাদের কারুকেই তার সত্যিকারে পুরুষ বলে মনে হয়নি। অনিন্দ্য তাকে বকাবকি করলেও তাকে দেখা মাত্র ফুলমণি মুগ্ধ হয়েছে। তার চোখে অনিন্দ্যই সত্যিকারে পুরুষ এবং শিল্পী। তাই অনিন্দ্য একটা ইঙ্গিত করা মাত্র ফুলমণি তার সঙ্গে চলে গেছে।

ফুলমণি এত কথা বলতে পারে?

এখন হয়তো তার মুখে কথা ফুটেছে।

অনিন্দ্যবাবু তো দমদমে থাকেন, তাইনা?

দমদমে এ-রকম ভাবে একটা মেয়েকে নিয়ে থাকা চলত না। সুন্দরবনে অনিন্দ্যদের একটা লাট আছে। চাষবাস হয়, মাছের চাষ হয়, একটা বাড়িও তৈরি করেছে। সেখানে অনিন্দ্য প্রায়ই ছবি আঁকতে বা মূর্তি গড়তে যায়। ও এমনিতেই কারুকে গ্রাহ্য করে না, আর সেখানে তো সমাজ বলতে কিছু নেই।

ফুলমণি কারুকে কিছু না বলে অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে চলে যাবে, এটা যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না চন্দনদা। যাই হোক, যদি সত্যি হয়, ফুলমণি তা হলে ভালই আছে। ওর জন্য ছোটপাহাড়িতে তোমাদের আর কোনও গোলমাল হয়নি তো?

নাঃ! তোকে মারধোর করার পর ওরা খানিকটা স্কেয়ার্ড হয়ে গেছে। আমরাও পুলিস প্রোটেকশান নিয়েছিলাম। আমি এখানে আসবার দুদিন আগে শুনলাম, ফুলমণি তার শ্বশুরের নামে দুশো টাকা পাঠিয়েছে মানিঅর্ডার করে। তাতে লোকে বুঝে গেল যে, সে স্বেচ্ছায় অন্য কোনও জায়গায় রয়েছে। এরপর আর আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। বুড়োটা বেশ মজাতেই আছে! এর মধ্যে আবার তার কোন এক ভাইপো বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে এসেছে ওই বাড়িতে। তারা বুড়োকে খুব আদরযত্ন করে খাওয়াচ্ছে। তার মানে, বুড়ো চোখ বুজলেই বাড়িটা হাতিয়ে নেবে।

ফুলমণিকে নিয়ে তাহলে আর আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না? যাক বাঁচা গেল!

তুই অবশ্য ইচ্ছে করলে একবার দেখে আসতে পারিস নীলু, কানু রায়ের কথা কতটা সত্যি। আমি অবশ্য তোকে যেতে বলছি না। তোর কোনও দায়িত্ব নেই, তুই যথেষ্ট ভুগেছিস।

যেতে হলে আমরা দুজনেই তো এক সঙ্গে—

আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না রে।

কেন?

নীপা দারুণ রেগে আছে। ফুলমণি অনিন্দ্যর কাছে আছে শুনেই বলল, তোমার বন্ধু একটা দুশ্চরিত্র। তোমরা পুরুষরা সবাই এ-রকম। ফুলমণির ছবি নিয়ে মাতামাতি করে তোমরা আসলে নিজেদের আর্ট-বোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছিলে, ওর জীবনটা কোনও মূল্য দাওনি। ওর শেকড় ছিঁড়ে ওকে ছোটপাহাড়ি থেকে উপড়ে আনার কী দরকার ছিল? এখন যদি আমি যাই?

অনিন্দ্য দাস বুঝি আগেও এ-রকম করেছে?

ওকে ছোটবেলা থেকে চিনি তো। মেয়েদের মন ভোলাতে একেবারে ওস্তাদ। ওর টেকনিকটা কি জানিস, ও মেয়েদের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে না, প্রেম জানায় না, প্রথমেই রুক্ষভাবে কথা বলে, এমনকী দুমদাম গালাগালি দেয়। আশ্চর্য! তাতেই অনেক মেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। চেহারাটা তো রাফ, মেয়েরা মনে করেও একেবারে রিয়েল মাচো, হি-ম্যান। কয়েক বছর আগে হাইকোর্টের এক জজের মেয়ে, দারুণ সুন্দরী, ওর জন্য একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

সে-মেয়েটি এখন কোথায়?

কে জানে!

তুমি না গেলে, আমিও যাবনা চন্দনদা।

যাস না। আমি মোটেই যেতে বলছি না। অনিন্দ্যদের গ্রামটার নাম বোয়ালভাসি, ক্যানিং থেকে লঞ্চে যেতে হয় গোসাবা, সেখান থেকে মাইল চারেক দূরে গ্রাম। ও, তোকে আর এসব কথা বলছি কেন, তুই তো সুন্দরবনের সবই চিনিস।

চন্দনদা চলে যাবার পর বোয়ালভাসি নামটা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল অনবরত। এক-একটা নাম, এক-একটা শব্দ হঠাৎ মনে গেঁথে যায় কেন যেন!

গোসাবার কাছে রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া, সজনেখালি এইসব গ্রাম আমি চিনি, গেছিও কয়েক বার। কিন্তু বোয়ালভাসির নাম আমি আগে শুনিনি। এক কালে এই সব অঞ্চল ছিল হ্যামিলটন সাহেবের জমিদারি, সাহেব চলে যাবার পর কিছু কিছু সমৃদ্ধ বাঙালি সেখানে ফার্মিং শুরু করেছিল।

রাস্তায় বেরুতে শুরু করার দু'তিন দিন বাদেই বুঝতে পারলাম, বোয়ালভাসি গ্রামটা আমাকে চুম্বকের মতো টানছে।

একটা অদম্য কৌতূহল, অনিন্দ্য দাসের মতো মানুষের সঙ্গে ফুলমণির কী করে জোড় মিলল, সেটা শুধু দেখে আসা।

তাহলে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে যাবার আগে একবার সুন্দরবনটাই ঘুরে আসা যাক।

গোসাবা পৌঁছে একটা সাইকেল ভ্যান ধরলাম। নিজের দুটো পা ছাড়া এটাই এখানকার প্রধান যানবাহন। ভ্যান চালককে বললাম, বোয়ালভাসি যাব গো, দাসবাবুদের খামারে।

ভ্যানচালক বলল, সেখানে তো দুটো দাসবাবুর খামার। কোনটায় যাবেন?

বললাম, এক জন দাসবাবু, খুব লম্বা, ছবি টবি আঁকেন, তাকে চেনো?

সে বলল, অ। যে-বাবু মেয়েছেলে দাঁড় করিয়ে তার মূর্তি বানায়, সে তো? হ্যাঁ চিনি।

বোঝা গেল, অনিন্দ্য দাস সেখানেও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে।

ভ্যানচালক মাইল চারেক ইটের রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে এসে একটা নদীর ধারে থেমে বলল, এবার খেয়া নৌকায় পার হয়ে যান। ওই যে দেখা যাচ্ছে ও-পারে দাসবাবুদের খামার।

খেয়ার নৌকোয় ওঠার পর আমার ভয় ভয় করতে লাগল।

অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। উনি এখন কী-রকম মেজাজে আছেন কে জানে। উনি যদি মনে করেন আমি অপমানের শোধ নিতে এসেছি! এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এখন বেলা তিনটে, আশা করি এখনই উনি মৌজ করে বসেননি!

খেয়াঘাট থেকে একটা সরু পথ গেছে দাসদের খামারের দিকে। খানিকটা ইটের দেওয়াল, খানিকটা কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। গেটটা খোলাই রয়েছে। তারপর মস্ত বড় একটা উঠোন, এক পাশে দুটো ধানের গোলা, অন্য পাশে একটা মস্ত বড় বাড়ি। প্রশস্ত বারান্দা, ওপরে টিনের চাল। উঠোনে হাঁস মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাঁচটা ছাগলছানা লাফাচ্ছে এক ছাগ-মাতার পেছন পেছন, আর এই সবকিছুর মাঝখানে, গনগনে রোদে দাঁড়িয়ে একটা পাথরের চাইতে ছেনি চালাচ্ছেন অনিন্দ্য দাস। পরনে শুধু জিনসের ট্রাউজার্স, খালি গা, মাথায় টোকা।

আমার প্রথমেই আশ্চর্য লাগল পাথরটা দেখে।

সুন্দরবন জলকাদার দেশ, এখানে এক টুকরো পাথর নেই, পাহাড় বহু দূরে। এখানে এত বড় পাথর এল কী করে?

আমার ধারণা ছিল, আজকালকার ভাস্কররা প্রথমে প্লাস্টার অফ প্যারিসের মূর্তি বানিয়ে তারপর ব্রোঞ্জ কাস্টিং করেন। এখনও পাথর কুঁদে কুঁদে মূর্তি বানানো হয়! অনিন্দ্য দাসের মতো দীর্ঘকায় বলশালী পুরুষ না হলে সম্ভবও না।

কোথা থেকে একটা কুকুর হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠতেই অনিন্দ্য দাস আমার দিকে ফিরে তাকালেন। চোখ কুঁচকে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বললেন, তুমি কে! তোমাকে আগে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।

আমি হাত তুলে বললাম, নমস্কার। হ্যাঁ, আপনি আমাকে আগে দেখেছেন। আমি চন্দন ঘোষালের ছোট ভাইয়ের মতো। আমি এ-দিকে সাতজেলিয়ায় এসেছিলাম এক জনের কাছে, শুনলাম আপনি এখানেই স্টুডিয়ো বানিয়েছেন, তাই আপনার কাজ দেখতে এসে পড়লাম। আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম বোধহয়।

অনিন্দ্য দাস এক গাল হাসলেন। মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, না, তুমি সাতজেলিয়ায় আসোনি। তুমি শালা এখানে স্পায়িং করতে এসেছ। দেখতে এসেছ, ফুলমণিকে আমি খেয়ে ফেলিচি না আস্ত রেখিচি।

তারপর চেঁচিয়ে দুজনকে ডাকলেন। প্রথমে বললেন, ফুলমণি, এ-দিকে এসো গো। দেখো, তোমার বাপের বাড়ির লোক এসছে।

আবার বললেন, নিরাপদ, একটা টুল নিয়ে আয়। কুটুমকে বসতে দে। আগে এল এক জন বাঁটকুল ধরনের লোক। আমার কাছে একটা টুল পেতে দিল।

অনিন্দ্য দাস খাতির করে বললেন, বসো, বসো ছোকরা। তোমাদের ছবিউলি মেয়েটাকে আমি টেনে হিচড়েও আনিনি, এখেনে জোর করে ধরেও রাখিনি। সে এলেই জিজ্ঞেস করো, নিজের ইচ্ছেতে এসেছে কি না।

অনিন্দ্য দাসের কথা শুনবকী, আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে নেমে এল ফুলমণি। এ কোন ফুলমণি? তাকে যে চেনাই যায় না। সে একটা বাটিক প্রিন্টের শাড়ি পরে আছে, মাথার চুল খোলা, এই দেড় মাসেই তার স্বাস্থ্য ফিরেছে অনেক। শীর্ণ ভাবটা মোটেই নেই, মসৃণতা এসেছে চামড়ায়, চোখের দৃষ্টিতে গভীরতা। সে এখন তাকিয়ে থাকার মতো সুন্দর। আগে বোঝা যায়নি, তার মুখখানা বেশ ধারালো।

কী করে ফুলমণির এতটা পরিবর্তন হল? একজন পুরুষের সঙ্গে উদ্দাম ভালবাসা, না পেট ভরে দু’বেলা খাওয়া, নাকি মনের ফুর্তি?

ফুলমণি আমাকে দেখে অবাক হয়েছে ঠিকই। কাছে এসে বলল, নমস্কার ছোটবাবু।

কানু রায় তো মিথ্যে বলেনি। ফুলমণির মুখে কথা ফুটেছে। আগে সে নিজের থেকে কোনও কথাই বলত না।

কিন্তু হঠাৎ একরাশ অভিমান ঢুকে গেল আমার গলার মধ্যে। ফুলমণির সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করল না। অ্যাকাডেমি থেকে অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে চলে আসার আগে ও একবার আমাকে বলে আসাবও প্রয়োজন মনে করেনি? আমি ওর ছোটবাবু নই, কেউ নই।

অনিন্দ্য দাস বললেন, হাঁড়িয়া আনিসনি? নিয়ে আয়। তোর নিজের লোককে খাওয়া।

নিরাপদ নামে বাঁটকুল লোকটিই নিয়ে এল কাঁচের জগ ভর্তি হাঁড়িয়া আর কয়েকটা গেলাস।

অনিন্দ্য দাস একচুমুকে এক গেলাস সাবাড় করে বলল, ফুলমণি ফার্স্টক্লাস হাঁড়িয়া বানায়। খেয়ে দেখো! সে-দিন, বুঝলে, অ্যাকাডেমিতে তুমি আমার সঙ্গে ঝঞ্ঝাট করছিলে, আমার বেশ রাগই হয়েছিল, ভাগ্যিস তোমাকে মেরে বসিনি। তোমার দোষ নেই, তুমি তো আমাকে চেনো না। আমি গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি যে এই মেয়েটাও এসেছে। আমি ওকে বললাম, অ্যাঁই ছুঁড়ি, তুই এইসব বাবুদের মধ্যে কী কচ্ছিস? যদি সত্যি ছবি আঁকতে চাস, ছবি আঁকা শিখতে চাস, তো আয়, আমার সঙ্গে। অমনি সুড়সুড় করে চলে এল।

আমি গেলাস হাতে নিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইলাম।

অনিন্দ্য দাস আবার বলল, ওকে এনে ভাল করিচি কিনা বলো! চেহারার কেমন চেকনাই হয়েছে দেখেছ? বুলু দেখেছ, বুলু!

অনিন্দ্য দাস ফুলমণির নিম্ন শরীরে চাপড় মারলেন দু'বার।

আমার দিকে তাকিয়ে আধখানা ঠোঁটে হেসে বললেন, বুলু মানে জানো? ওদের ভাষায় ঊরুকে বলে বুলু! আরও অনেকগুলো সাঁওতালি কথা শিখেছি। এরা পাগলকে বলে কঙ্কা। এ বেটি প্রায়ই আমাকে বলে কঙ্কা, কঙ্কা, প্রথমে বুঝতুম না। পাহাড়কে বলে বুরু। ঠোঁট হচ্ছে লুটি আর বুক হচ্ছে কোড়াম। আঙুল হচ্ছে কাটুকা। বেশ, না? এই সব শব্দ বাংলা ভাষাতেও নিয়ে নেওয়া উচিত আর পড়হাও-কুঁড়ি মানে কী বলল তো? ছাত্রী! এই মেয়েটা আমার পড়হাও-কুঁড়ি! অবশ্য আমি ওকে ছবি আঁকতে দিইনা এখনও।

এবার আমি একটু চমকে উঠলাম।

অনিন্দ্য দাস বললেন, কেন আঁকতে দিই না জানো? আরে বাবা, ছবিই বলো, আর যে-কোনও শিল্পই বলল, আগে ফর্মটা ভাল করে শিখে নিয়ে তারপর ফর্ম ভাঙতে হয়। না ভাঙলে নতুন কিছু গড়া যায় না। শিল্পের ফর্ম ভাঙতে গেলে জীবনটাকেও কিছু ভাঙচুর করতে হয়। চাকরি-বাকরি, রোজগার, রোজ রাত্তিরে কখানা হাতে গড়া রুটি আর তরকারি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া, বছরের পর বছর এ-রকম জীবন কাটিয়ে শিল্প হয় না। ওকে ওর আগেকার জীবনের বাপের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছি। সব উলটো পালটা হয়ে যাক! আর একটা কথা। অশিক্ষিত পটুত্বের আমি ইয়ে মারি। ও-সব দিন চলে গেছে। শিখতে হয়, সব গোড়া থেকে শিখতে হয়। ভেতরে মালমশলা আছে বলে দু'চারখানা ছবি এঁকে ফেলল, কিন্তু তা দিয়ে শিল্প হয় না। দু'দিনে একঘেয়ে হয়ে যায়। ফোক আর্ট সব একই রকম। মহৎ শিল্পীর হাতে হাজার রকম খেলা। জীবনটাকে শিল্প করে না নিলে তা হয় না। ফুলমণিকে আমি বলেছি, এখন এক বছর শুধু সোজা সোজা দাগ টেনে যা। চোখ বুজে মানুষের মুখটা দেখতে শেখ।

লম্বা লেকচার দিচ্ছেন বটে, তবু ওঁর কোনও কথাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হঠাৎ ফুলমণিকে কাছে ডেকে তিনি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন, এ মেয়েটার প্রোফাইলটা দারুণ! প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল মাগিটাকে পাথরে ধরতে হবে।

পরক্ষণেই ফুলমণিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, অ্যাই হারামজাদি, আর মোটাবি না বলে দিচ্ছি। যদি দেখি আরও মুটিয়েছিস, মেরে একেবারে পাট করে দেব।

ফুলমণিকে এখনও কোনওক্রমেই মোটা বলা যায় না। আমি অনেক আদিবাসী পল্লিতে ঘুরেছি। সাঁওতাল, ওরাওঁ, হো, মুণ্ডা, লোধাদের মধ্যে এ পর্যন্ত এক জনও স্থূলকায়া মহিলা দেখিনি।

অনিন্দ্য দাসের এই সব ভাষা শুনেও ফুলমণি মিটমিটিয়ে হাসছে।

আমি পাথরটার পেছন দিকে বসে আছি। অনিন্দ্য দাস ডাকতেই সামনের দিকে গিয়ে অবাক হলাম। ফুলমণির অনেকখানি প্রতিমূর্তি গড়া হয়ে গেছে। তার নগ্ন প্রতিমূর্তি।

আমি ভাস্কর্য কিছুই বুঝি না। তবে দেখেই মুগ্ধ হলাম। এর সঙ্গে দেবীপ্রসাদ, রামকিঙ্করের কোনও মিল নেই। হেনরি মুর বা রদ্যাঁর ধরনেরও নয়। অনেকটা যেন রিলিফের মতো। পাথরটা পাথরই থাকছে, তার মধ্য থেকে একটা বেশ চিনতে পারার মতো মূর্তি ফুটে বেরুচ্ছে।

অনিন্দ্য দাস বললেন, আমি আর্টকে কমার্সিয়াল করিনি। আমার মূর্তি বেচি না। শেষ হবার পর এটা কোথায় বসাব জানো, চমটা ব্লকে, নদীর মোহনার ধারে। সমুদ্র দিয়ে জাহাজ যাবে, নৌকোর মাঝিরা দেখবে। জঙ্গলের বাঘেরা এসে মূর্তিটাকে আদর করবে। কয়েকশো বছর বাদে লোকেরা ভাববে, সুন্দরবনের নরম মাটিতে একটা পাথরের মূর্তি গজিয়ে উঠল কী করে? নিশ্চয়ই আকাশ থেকে দেবতারা ফেলেছে। সেইভাবে আমি দেবতা হয়ে যাব। হা-হা-হা-হা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পাথরটা আপনি আনলেন কী করে?

অনিন্দ্য দাস বললেন, বাজে প্রশ্ন। নৌকোয় আনিয়েছি। ঘাটশিলা থেকে। আর একটা মূর্তি দেখবে। এসো।

বাড়ির পেছন দিকে একটা বাগান। সেখানে একটা প্রমাণ সাইজের মূর্তি বসানো আছে। সেটাও ফুলমণির। কঠিন পাথরের মধ্যে ফুলমণির লাজুক ভাবটা কী আশ্চর্য ফুটেছে। অনিন্দ্য দাস সত্যিই শক্তিশালী শিল্পী।

অনিন্দ্য দাস বললেন, অ্যাই ফুলমণি, তুই এই মূর্তিটার পাশে দাঁড়া।

আমাকে বললেন, একবার দেখো, খুঁটিয়ে দেখো, ফুলমণির চেহারার সঙ্গে মুর্তিটায় কিন্তু মিল নেই। অথচ মিল আছে। এই অথচ মিলটাই আসল। ক'জন শালা এটা বোঝে?

বাঁটকুল লোকটি এবার এসে বলল, আপনারা এবার খাবেন না? বিকেল হয়ে গেল।

অনিন্দ্য দাস বললেন, কী রেঁধেছিস? নিয়ে আয় না শুয়ার। বক বক করছিস কেন?

নিরাপদ সঙ্গে সঙ্গে এক ডেকচি খিচুড়ি নিয়ে এল। কলাপাতায় বেড়ে দিয়ে গেল হাতে হাতে। বিকেল সাড়ে চারটের সময় এই ওদের দুপুরের খাবার। শুধু কলাপাতায় খানিকটা খিচুড়ি, ভেতরে অবশ্য আলুটালু আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া। অনিন্দ্য দাস খিচুড়ি খেতে খেতেই হাঁড়িয়ার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। ফুলমণিও হাঁড়িয়া খেয়ে যাচ্ছে সমানে।

আমি খানিকটা খিচুড়ি খেয়ে পাতাটা নামিয়ে রাখলাম।

অনিন্দ্য দাস ধমক দিয়ে বললেন, এই, এই, ও কী, আরও নাও। নিরাপদ, ওকে আরও খিচুড়ি দে। বেগুনভাজা কোথায়? হারামজাদা, আজ একটু মাছও জোগাড় করতে পারলি না? সবাই বলে সুন্দরবন মাছের দেশ, অথচ এখানেই মাছ পাওয়া যায় না। সব কলকাতায় চলে যায়।

আমি বললাম, না, আমি আর খাব না।

কেন খাবেনা? ওইটুকু খেলে পেট ভরে? খাও, খাও।

না, আমাকে এবার যেতে হবে। এরপর আর ফেরার লঞ্চ পাবনা।

ফিরবে কেন? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে, চাঁদু? এখানে থেকে যাবে। উঠোনে খাটিয়া পেতে দেব রাত্তিরে। এই গরমে আমরা সবাই উঠোনে শুই। ভয় নেই, বাঘ আসবে না।

মাটি থেকে আমার ঝোলাটা তুলে নিয়ে বললাম, আমাকে ফিরতেই হবে আজ।

ফুলমণি ঈষৎ নেশাগ্রস্ত গলায় বলল, কেন যাবে? থাকো, থাকো।

এই প্রথম আমি ফুলমণির দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি তোমাকে নিয়ে এই যে-মূর্তিটা গড়েছে তোমার কেমন লেগেছে?

ফুলমণির মুখ হাসিতে ঝলমল করে উঠল।

অনিন্দ্য দাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, মূর্তি তো গড়ে নাই।

তারপর আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, উ গড়াইছে।

ওরে বাবা, এত প্রেম!

হাতের কলাপাতায় খিচুড়ি নিয়েই ওরা আমাকে বিদায় দিতে এল গেট পর্যন্ত। ফুলমণি কঞ্চির বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, অনিন্দ্য দাস তার এঁটো হাত ফুলমণির কাঁধে রাখলেন। আমাকে বললেন, এই ছেলে আবার আসিস। যখন খুশি চলে আসবি।

ওদের দুজনের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গিটা আমার চোখে লেগে রইল। আমি আর এখানে কখনও আসবনা।

.

১০.

ফুলমণির কাহিনি এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে এ-রকম একটা সুখের মিলন হলেও সেটা হয় ইচ্ছাপূরণ। বাস্তব বড় নিষ্ঠুর। ফুলমণি আর অনিন্দ্য দাসের মতো দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ কি সারা জীবন একসঙ্গে কাটাতে পারে।

বোয়ালসিতে ওদের দুজনের উদ্দাম জীবনের একটা টুকরো ছবি আমি দেখে এসেছি, তা আসলে এক ধরনের পিকনিক। ভারি চমৎকার, খুব লোভনীয়, কিন্তু পিকনিক একটানা কত দিন চলে?

ফুলমণির জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, আমার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ নেই অবশ্য, কিন্তু খবরগুলো আমার কানে এসেছে।

অনিন্দ্য দাস কোনও এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকার মানুষ নন। সেই জন্য তিনি বিয়েই করেননি। মেয়েরা তার মাথায় উত্তেজনা জোগায়, তার কাজে গতি আনে। তিনি প্রেরণা-ট্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। স্নায়বিক উত্তেজনা আর ফুর্তিই তাঁর কাছে প্রধান।

একথাও শুনেছি, তিনি কোনও মেয়েকেই প্রতারণা করেন না। তার বিবেক পরিষ্কার। যে-মেয়েকের পছন্দ হয়, তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, এই তুই আসবি আমার সঙ্গে? বোয়ালভাসির খামারে গিয়ে থাকবি? যে রাজি হয় না, তাকে তিনি জোর করেন না। তার দিকে আর ফিরেও তাকান না। আর যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজি হয়ে যায়, সে যায় নিজের দায়িত্বে, কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, ভবিষ্যৎ নিয়ে গাঁটছড়া বাঁধার কোনও সম্ভাবনাও নেই।

ফুলমণির সঙ্গে অনিন্দ্য দাসের পিকনিক সাত মাসেই শেষ হয়ে গেছে।

ফুলমণির ছিপছিপে ধারালো শরীরটা ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হিসেবে অনিন্দ্য দাসের পছন্দ হয়েছিল। ফুলমণিকে মডেল করে দুটো মূর্তি গড়েছেন তিনি। বিষয়বস্তু হিসেবে সে ফুরিয়ে গেছে। যে-বিষয়বস্তু একবার ব্যবহার করা হয়ে যায়, তার প্রতি শিল্পীদের আর কোনও আকর্ষণ থাকে না। এরপর ফুলমণি একটি সাধারণ নারী।

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে এক দিন অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

আমি ছিলাম অন্য টেবিলে, উনি অনেক দূরে। চোখাচোখি হতেও আমি চেনার কোনও ভাব দেখাইনি, উনিই উঠে এলেন এক সময়।

খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, কী খবর নীলু? চন্দন এখন কোথায় থাকে? সেই ছোটপাহাড়িতে? ওর ওখানে একবার যাব। কী করে ছোটপাহাড়িতে যেতে হয় বলো তো? কোন স্টেশানে নামতে হয়? সেই মেয়েটার কোনও খবর জানো?

তার খবর তো আমার জানবার কথা নয়। আমি ছোটপাহাড়ীতে আর যাইনা।

হ্যাঁ, এক দিন রাগ করে চলে গেল, আমি ভাবলাম আবার হয়তো আসবে একবার।

অন্য এক জন চেনা লোক অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে কথা বলা শুরু করতেই তিনি আমাকে যেন ভুলে গেলেন। সেই লোকটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন দরজার দিকে।

আমাকে দেখে ফুলমণির কথা একবার মনে পড়েছিল অনিন্দ্য দাসের। কিন্তু সেই মনে হওয়ার কোনও গভীরতা নেই। কয়েক মিনিটের জন্য স্মৃতির আন্দোলন। ছোটপাহাড়িতে তিনি সত্যি সত্যি ফুলমণিকে আর দেখতে যাবেন না, আমার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ছোটপাহাড়ি যাবার সন্ধানও নিলেন না।

সিরাজুল তারিক সাহেবও ফুলমণি সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটার পর থেকেই তিনি ফুলমণি সম্পর্কে আর একটি কথাও বলেননি কখনও কলকাতার শিল্প জগতে ফুলমণির নামটা কয়েকটা দিনের জন্য উঠেই আবার মিলিয়ে গেছে, বুদবুদের মতো। প্রদর্শনীতে ফুলমণির একটি মাত্র ছবি বিক্রি হয়েছিল। দু'হাজার টাকায় কিনেছিলেন প্রখ্যাত এক জন শিল্পী। ছবিটাই তার পছন্দ হয়েছিল। ছবির শিল্পী সম্পর্কে তিনি কোনও কৌতূহল দেখাননি।

ভবিষ্যতে অনিন্দ্য দাসের ভাস্কর্য প্রসঙ্গেও ফুলমণির নামটা কখনও উঠবে কিনা সন্দেহ। অনিন্দ্য দাসের ভাষায় 'অথচ মিল আছে' ক'জনের নজরে পড়বে?

চন্দনদা যদি ফুলমণির ছবি নিয়ে ব্যবসা করতে চাইতেন, নীপাবউদির ঈর্ষাফির্সা অগ্রাহ্য করে ওর পেছনে টাকা ঢালতেন, ওকে ছবি আঁকার সব সুযোগ করে দিতেন, তাহলে ফুলমণির প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশা ছিল, ওর ছবিও বিক্রি হত। সেই রকম এক জন প্রফেশনাল প্রোমোটারের দরকার ছিল, নিছক শখের পরোপকারীরা বেশি দূর যেতে পারে না। অনিন্দ্য দাস একবার ছুঁয়ে দিয়েছেন বলে আমরা আর কেউ ফুলমণির দিকে তাকাইনি।

অনিন্দ্য দাস ছোটপাহাড়িতে গেলেও অবশ্য ফুলমণির দেখা পেতেন না। চন্দনদার কাছে শুনেছি, ফুলমণি ছোটপাহাড়িতে ফিরলেও তার শ্বশুরের ভাইপো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে-লোকটি বাড়ি, জমিজমা দখল করে বসেছে, সে ও-বাড়ির একটা বিধবা বউকে ঠাঁই দেবে কেন? ফুলমণির নামে নানা বদনাম দেওয়া, এমনকী তাকে ডাইনি সাজানোও সে-লোকটির পক্ষে সহজ। একলা একটা মেয়ের তুলনায় এক জন বিবাহিত, সংসারী মানুষকে সব সমাজই বেশি বিশ্বাস করে।

ফুলমণি ছোটপাহাড়িতে নেই, সে আবার হারিয়ে গেছে।

এর পরেও কেটে গেছে এক বছর।

আমি আবার গা আলগা করে ঘুরে বেড়াই, কেউ আমাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। দাদা অবশ্য প্রায়ই রাগারাগি করে, কিন্তু আমার বউদির মতে, প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে এক জন অন্তত বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরে বা অভিযাত্রী থাকা উচিত, না হলে সে-সমাজটা বর্ণহীন হয়ে যায়। সেই সুবাদে আমি বাড়িতে দু'বেলা খেতে পাই।

মাঝে মাঝে অন্যের ফাই ফরমাস খেটে আমার কিছু কিছু রোজগারও হয়।

কেউ কেউ আমার হাত দিয়ে জরুরি কাগজপত্র পাটনা কিংবা ভুপালে পাঠায়। কারুর হয়তো বৃদ্ধা মা কিংবা অশক্ত ঠাকুর্দাকে কাশী কিংবা এলাহাবাদ পৌঁছে দেবার কোনও লোক নেই, তখন আমি আছি। ট্রেন ভাড়া ছাড়াও হাতখরচ মন্দ জোটে না।

লালুদার এক আত্মীয় থাকে ঝুমরি তিলাইয়ায়, তাকে একটা সম্পত্তির দলিল পৌঁছে দিতে হবে, সেই ভারটা পেয়ে গেলাম আমি। টাকা-পয়সার ব্যাপারে লালুদা উদার, আমাকে হাতখরচ দিয়েছে পাঁচশো টাকা।

একটা স্টেশনে ট্রেন পালটাতে হবে, বসে আছি প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে।

ট্রেনের পাত্তা নেই। একটা মালগাড়ি থেমে আছে অদূরে, সেটা না গেলে আর ট্রেন আসবে না। গোটা স্টেশানটায় ভ্যান ভ্যান করছে মাছি। কিছু বাসি কচুরি, তরকারি আর দরবেশ যা বিক্রি হচ্ছে, তা মানুষের অখাদ্য, মাছিরই খাদ্য।

রেললাইন থেকে পোড়া কয়লা কুড়োচ্ছে গোটা পাঁচেক নানা বয়সী মেয়ে। প্ল্যাটফর্মে ওদেরই কেউ একটা বাচ্চাকে শুইয়ে রেখেছে, চিৎহয়ে বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে।

অলস ভাবে তাকিয়ে ছিলাম, একসময় চোখ আটকে গেল।

কোনও সন্দেহ নেই, ওই মেয়েগুলোর মধ্যে এক জন ফুলমণি। আবার সেই আগেকার মতো রোগা চেহারা, পরনের নীল পাড় সাদা শাড়িটা যেমন ময়লা, তেমনি ছেঁড়া, মাথার চুল জট পাকিয়ে গেছে। মাথায় ঝুড়ি ভরে কয়লা তুলে তুলে প্ল্যাটফর্মের অনেক দূরে একটা কোণে জড়ো করে রাখছে।

হোক না ফুলমণি, তাতে আমার কী আসে যায়? ছবি আঁকা ছেড়ে কেউ যদি কয়লাকুড়োনি হয়, আমি তার কী করব?

অন্য কোনও কাজ নেই, সঙ্গে একটা বইও নেই, তাই বসে বসে দেখতে লাগলাম মেয়েগুলোকে। একটি মেয়েরও স্বাস্থ্য ভাল নয়। কয়লা তুলে দু'বেলার অন্ন জোটে না বোধহয়।

ঝুড়ি খালি করে ফেরার সময় মেয়েরা কেউ না-কেউ বাচ্চাটাকে একটু আদর করে যাচ্ছে। ওটা কার বাচ্চা? ফুলমণির? খুবই স্বাভাবিক।

কাছেই নিশ্চয়ই ওদের ঝুপড়ি আছে। সেখানেই জীবন কেটে যাচ্ছে, এক-একটা রেল স্টেশনে অনেকগুলো পরগাছার জীবিকার সংস্থান হয়।

ফুলমণি যদি নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে কথা না বলত, তাহলে পরবর্তী চিন্তাটা আমার মাথাতেই আসত না।

অন্য মেয়েরা মাঝে মাঝে কল কল করে কথা বলে উঠছে, কিন্তু ফুলমণি আগের মতোই নীরব। ফুলমণি অন্যদের মতো নয়। ওর নীরবতা ওর অহঙ্কার।

আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফুলমণি একবার থমকে দাঁড়াল। নীরবতা ভেঙে বলল, ছোটবাবু।

কবে আমার চাকরি গেছে, আমি আর ছোটবাবু নই, কোনও বাবুই নই, তবু এই ডাক শুনে যেন আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

আমি শুধু বললাম, ফুলমণি।

ব্যাস ওইটুকুই। আর কোনও বাক্য বিনিময় হল না। ফুলমণি আবার লাইনে নেমে গেল।

কী কথা বলব ওকে? ওর অতীত ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করে কী লাভ? কয়লা কুড়িয়ে যার দিন চলে, তার ছবি আঁকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

প্ল্যাটফর্ম থেকে রেল লাইন বেশ নিচু। ঝুড়িভর্তি কয়লা নিয়ে ওপরে উঠতে মেয়েদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। একবার ফুলমণি উঠতে গিয়ে তার কয়লার ঝুড়িটা উলটে গেল। তখনই আমার মাথায় এল সেই চিন্তাটা।

আমি উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ফুলমণিকে টেনে তুললাম ওপরে। জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি আমার সঙ্গে যাবে?

কোথায়?

অনেক দূরে, পোড়া কয়লা কুড়োবার চেয়ে কোনও খারাপ কাজ সেখানে করতে হবে না। ফুলমণি এ-দিক ওদিক তাকাল। খালি ঝুড়িটা সরিয়ে নিল খানিকটা। তারপর বলব, যাব।

অনিন্দ্য দাসের আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিল ফুলমণি। ঠিক সেই রকম ভাবেই রাজি হয়ে গেল আমার এক কথায়? ফুলমণি স্থাণু হতে চায় না। পরিবেশ বদলাতে চায় সব সময়। অনিন্দ্য দাস যেমন বলেছিল, ও জীবনকে ভাঙছে?

হাতের ধুলো ঝেড়ে ফুলমণি বাচ্চাটাকে একবার গাল টিপে দিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বাচ্চাটা তোমার?

ফুলমণি বলল, না, আমার বাচ্চাটা এইটুকুন হয়েই মরে গেছে।

আমি মনে মনে বললাম, এক দিক থেকে ভালই হয়েছে। বাচ্চা কাচ্চা সঙ্গে থাকলে ঝামেলা হত।

স্টেশনের বাইরে বাস দাঁড়িয়ে আছে।

বাস পালটাতে হল তিনবার। ফুলমণি আর একবারও জিজ্ঞেস করল না, কোথায় যাচ্ছি।

সন্ধে হয়ে এসেছে। শেষবার বাস থেকে নেমে আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাঁতার জানো?

ফুলমণি দু'বার মাথা ঝোঁকাল।

এবার খানিকটা জঙ্গলের পথ। দুপুর দু'বার আমরা শুধু ঝালমুড়ি খেয়েছি। ফুলমণির শরীর দুর্বল। খিদেয় নিশ্চয়ই আরও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মুখে তার কোনও চিহ্ন নেই। অনিশ্চিতের দিকে যাত্রা ওকে টানছে।

জঙ্গলের রাস্তাটা ছমছমে অন্ধকার। কোনও একটা প্রাণী পাশ দিয়ে ছুটে যেতেই ফুলমণি থমকে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরল।

এই প্রথম আমার হাত ধরল ফুলমণি। প্রথম ও শেষবার।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছলাম নদীটার কাছে। বেশ চওড়া নদী, স্রোত আছে, তবে খুব গভীর নয়। মাঝখানটায় শুধু সাঁতরে যেতে হবে।

ওপরে মিট মিট করে দু-চারটে আলো জ্বলছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় পাতা-পোড়া আগুন।

আমি ফুলমণির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, এই নদী পার হয়ে সোজা চলে যাও। ও-পারে দিকশূন্যপুর নামে একটা গাঁও আছে। সেখানে আছে বন্দনাদি। তার কাছে গিয়ে বলবে, নীলু তোমাকে পাঠিয়েছে। ব্যাস, তোমার আর কিছু চিন্তা করতে হবে না। তুমি খাবার পাবে। থাকার জায়গা পাবে। তোমার যা খুশি তাই করতে পারো। ইচ্ছে হলে ছবিও আঁকতে পারো। বসন্ত রাও, রোহিলা এরাও ছবি আঁকে। ওরা তোমাকে রঙ-তুলি দেবে। ফুলমণি জিজ্ঞেস করল, তুমি যাবে না?

আমি বললাম, ওখানে সবাই একলা যায়। তোমার কোনও ভয় নেই। দিকশূন্যপুরের বন্দনাদিকে আমার নাম করলেই হবে। আমি এখন গেলে ফিরতে পাব না। আমি যে অন্য লোকের কাজ নিয়ে এসেছি।

হাঁটু পর্যন্ত জলে আমি গেলাম ওর সঙ্গে সঙ্গে, তারপর থেমে পড়ে বললাম, এবার তুমি একা যাও।

ফুলমণি নিষ্পলকভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর জল ঠেলে এগিয়ে গেল। একটু পরে তাকে আর দেখা গেল না। শুধু শোনা যেতে লাগল জলের শব্দ।

হাঁটুজলে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

যাও ফুলমণি দিকশূন্যপুরে। ওখানে কেউ তোমাকে ছোট করবে না। ওখানে ওরা যে সবাই সমান। কেউ তোমাকে আদিবাসী বলে আলাদা করে দেখবে না। কারণ ওরা মনে করে সকলেই এই পৃথিবীর আদিবাসী। ওখানে কাজের কোনও অভাব নেই, কারণ কারুর লোভ নেই। ওরা নিজের জন্য কিছু রাখতে চায় না। অন্যকে দিয়ে আনন্দ পায়, সবাই অন্যকে দেয় বলে সবার সব কিছু থাকে। ওখানে দুঃখ আছে, সব মানুষেরই দুঃখ থাকে, কিন্তু ওখানে অপমান নেই। দিকশূন্যপুরে কোনও নিয়ম নেই, মানুষের ইচ্ছেটাই নিয়ম।